ধারাবাহিক উপন্যাস • খেলাধুলো • অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ
বিশেষ সংখ্যা
আনন্দমেলা
সত্যজিৎ রায়ের কাহিনি অবলম্বনে
সম্পূর্ণ শঙ্কু কমিক্‌স
শঙ্কু ও ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন
৪টি সম্পূর্ণ উপন্যাস
বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজশ্রী বসু অধিকারী
মহুয়া সমাদ্দার
সুবর্ণ বসু
৫টি চমকদার গল্প
প্রচেত গুপ্ত
দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য
অদিতি ভট্টাচার্য
উৎসব চট্টোপাধ্যায়
স্বর্ণেন্দু সাহা
অভিজিৎ
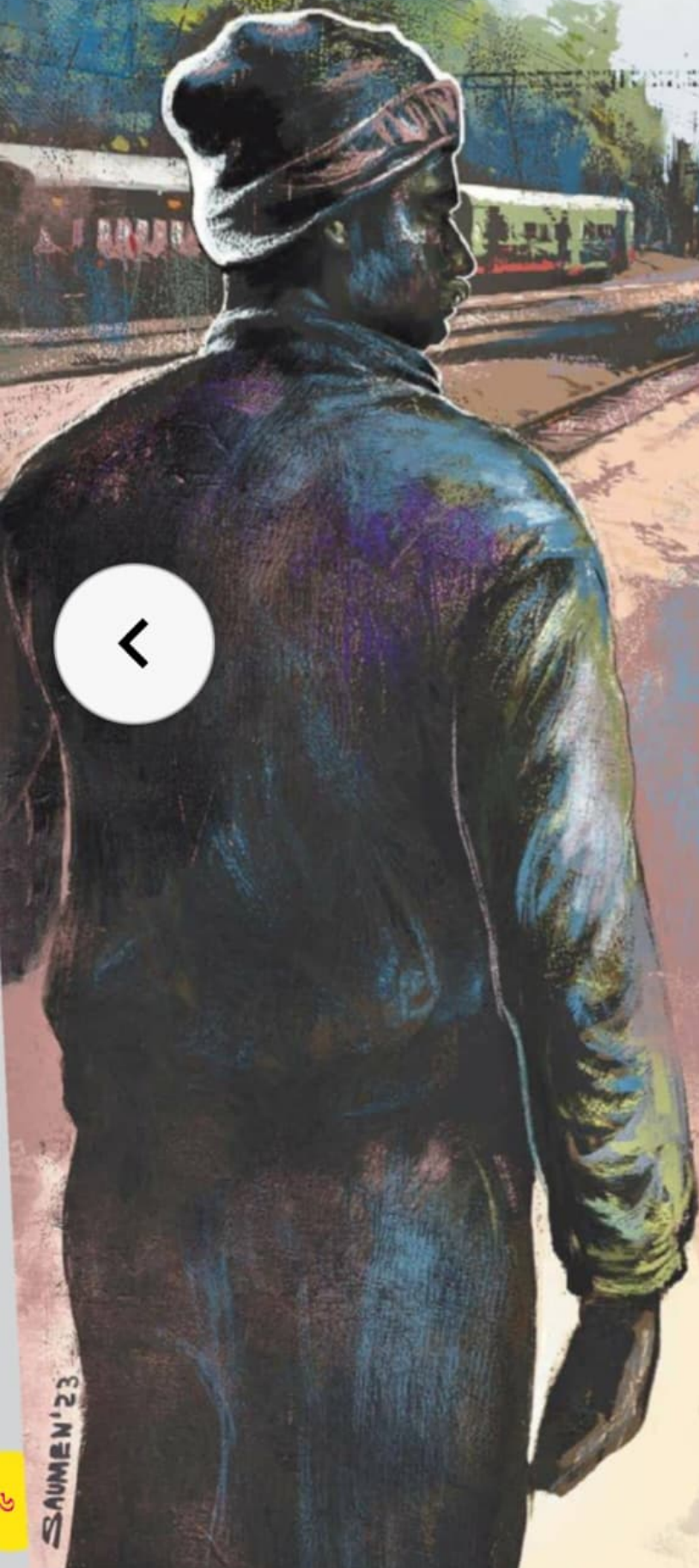
ক্লাস সেভেনের বিজন

প্রচেত গুপ্ত

পরিমল রায়ের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। বিজন না? বিজনই তো মনে হচ্ছে। রোগা-পাতলা চেহারাটা মোটাসোটা হয়েছে। তখনই বেশ লম্বা ছিল, এখন আরও বেড়েছে। গায়ের রং খানিকটা তামাটে হলেও ফরসা ভাবটা হারিয়ে যায়নি। মাথায় কায়দা

করা একটা গল্‌ফ হ্যাট।

পরিমলবাবুর ভিতরে কেমন একটা অস্বস্তি শুরু হল। বেঞ্চের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা লাঠির মাথাটা চেপে ধরলেন। বছর খানেক আগে বাথরুমে পড়ে যাওয়ার পর থেকে বাইরে বেরোলে লাঠি নেওয়া শুরু করেছেন। লাঠি-ধরা হাতটা অল্প কাঁপল যেন। এক জনকে 'বিজন' বলে চিনতে পেরে তিনি কি ভয় পেলেন?

কী যেন পদবি ছিল বিজনের? বটব্যাল? নাকি পালিত? মনে পড়ছে না। কত বছর পর ক্লাস সেভেনের সহপাঠীকে দেখছেন? বাহান্ন? নাকি তিপ্পান্ন? তখন বয়স ছিল তেরো, এখন পঁয়ষট্টি। সেই হিসেবে বাহান্ন বছর পর। এত বছর পর হুট করে কাউকে দেখলে চেনা কঠিন। চেহারা বদলে যায়। তা ছাড়া এই বয়সে মানুষ চেনায় গোলমাল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। চেনা-অচেনা গুলিয়ে যায়। তার পরেও এখন কেন যেন পরিমলবাবুর মন বলছে, এই লোক বিজন। পরিমলবাবু রেলস্টেশনের যে বেঞ্চে বসে আছেন, সেখান থেকে একটু দূরে চায়ের দোকান। সেখানে দাঁড়িয়ে লোকটা ভাঁড়ে চা খাচ্ছে। ফিটফাট পোশাক। ধূসর ট্রাউজ়ার্সের উপর গাঢ় বাদামি রঙের ফুলহাতা সোয়েটার। পায়ে কেড্‌স। গলায় কালো মাফলার কায়দা করে ঝোলানো। মাথায় টুপি তো রয়েছেই। স্মার্ট দেখাচ্ছে। বিজন কিন্তু স্মার্ট ছিল না, ক্যাবলা ধরনেরই ছিল। সাজপোশাকের মোটেও খেয়াল রাখত না। চুল না-আঁচড়ে, প্যান্টের ভিতর ভাল করে জামা না-গুঁজে, জুতোর একটা ফিতে খুলে স্কুলে চলে আসত। পরিমলবাবু অবাক হলেন। মানুষ কত বদলে যায়!

লোকটা ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতেই মুখ ফেরাল। পরিমলবাবুর বুক ধড়াস করে উঠল। না, ভুল হয়নি, অবিকল বিজনের মতো। শুধু বয়সটাই যা বেড়েছে। পরিমলবাবু বুঝতে পারলেন, তাঁর ভয় বাড়ছে।

স্কুলের সহপাঠীকে দেখে ভয় করবে কেন?

পরিমলবাবু এখানে এসেছেন পাঁচ দিন হল। এসেছেন হাওয়া বদল করতে। মাস কয়েক শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। হজম, ঘুমের সমস্যার জন্য পুরনো সহকর্মী সুবল প্রামাণিক বেড়াতে আসার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

"কিছু হয়নি আপনার, ক'দিন বাইরে থেকে ঘুরে আসুন দেখি। কলকাতার হাওয়া-বাতাসে অসুখ গিজগিজ করছে, বাইরে গেলেই দেখবেন সব পালিয়েছে।"

পরিমলবাবু বলেছিলেন, "না থাক। একা মানুষ, কোথাও গিয়ে শরীর যদি আরও খারাপ হয়!"

সুবলবাবু ভরসা দিয়ে বললেন, "একা মানুষ বলেই তো হুট করতে বেরিয়ে পড়তে পারবেন, পিছুটান নেই। কিছু হবে না শরীরের। এমন জায়গায় যাবেন পরিমলদা যে, পনেরো দিনে একেবারে ফিট হয়ে যাবেন, চনমন করবেন। রাজি থাকলে বলুন, ব্যবস্থা করছি। আপনাকে কোনও ঝামেলা নিতে হবে না।"

এ কথা শুনে পরিমলবাবুর খানিকটা লোভই হল। বললেন, "জায়গাটা কোথায়?"

সুবলবাবু বললেন, "মধুপুরের কাছে, নাম ধূপপুর। আমার বড় শ্যালকের ওখানে বাড়ি রয়েছে। ছোট এক তলা, বাগান দেওয়া ছিমছাম বাড়ি। দেখলে মন জুড়িয়ে যাবে। কেয়ারটেকার, রাঁধুনি, মালি সবাই রয়েছে। আপনি যদি রাজি হন, আজই খবর দিই। নিজে ঘুরে ঘুরে বাজার করবেন। টাটকা সব্জি, দেশি মুরগি, পুকুরের মাছ সব পাওয়া যায়। রোজ সকাল-বিকেল এক মাইল করে হাঁটবেন, খিদেতে পেট চুঁই চুঁই করবে। অসুখ পালানোর পথ পাবে না। শীতটা একটু বেশি এই যা। তা হোক, গরম জামাকাপড় থাকলেই হবে। শ্যালককে বলব নাকি?"

এর পর রাজি না হয়ে উপায় কী ছিল? ধূপপুরে পৌঁছে দারুণ লাগছে পরিমলবাবুর। মনে হচ্ছে, ভাগ্যিস এসেছেন। ছিমছাম এক টুকরো শহর। শহর না বলে, রেল স্টেশন বলা ভাল। স্টেশনের দু'পাশে বাড়িঘর। একটু গেলেই পাকা ঘরবাড়ি শেষ। খেত আর গাঁ। এক পাশে টিলা, এক পাশে জঙ্গল। সবচেয়ে সুন্দর হল সুবলের ব্যবস্থা করে দেওয়া বাড়িটি। একতলা বাড়ির ছাদে চেয়ার নিয়ে বসে থাকলেই আকাশ, গাছ, দূরের টিলা, পাখির ডাক— সব পাওয়া যায়। রাঁধুনিমাসির রান্নার হাতটিও খাসা। খাওয়া এই ক'দিনে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। এক-এক দিন বিকেলে এক-এক দিকে বেড়াতে বেরোন পরিমলবাবু। তবে সন্ধের খানিক আগে এক বার করে রেলস্টেশনে আসবেনই। ছোট্ট রেলস্টেশনটা খেলনার মতো সুন্দর। পরিপাটি করে রাখা। অনেকটা নিচু প্ল্যাটফর্মে বড়

বড় গাছ আর গোটা দু'-তিন লোহার বেঞ্চ। হাতে গোনা ক'টা ট্রেন দাঁড়ায়, বাকিরা ছুটে পালায়। অন্য সময়টা নির্জন স্টেশন ঝুম মেরে পড়ে থাকে। এক কোনায় একটা চায়ের স্টল। অন্ধকার নামলে সেটাও ঝাঁপ ফেলে। আর তখনই পরিমলবাবু বাড়ির পথ ধরেন। স্টেশন থেকে বাড়ি হেঁটে মোটে ছ'-সাত মিনিট। সুবলকে মনে মনে ধন্যবাদ জানান পরিমলবাবু। ঠিক করে রেখেছেন, কলকাতায় ফিরে একটা ভাল কিছু উপহার নিয়ে ওঁর বাড়ি যাবেন। উপহার কী হবে,

জানান পরিমলবাবু। ঠিক করে রেখেছেন, কলকাতায় ফিরে একটা ভাল কিছু উপহার নিয়ে ওঁর বাড়ি যাবেন। উপহার কী হবে, তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তাও করছেন।

আজও টিলার দিকটায় ঘণ্টা খানেক ঘুরে আসার পর স্টেশনে এসেছেন পরিমলবাবু এবং এমন এক জনকে দেখতে পেয়েছেন, যাকে বাহান্ন বছর আগের সহপাঠী 'বিজন' বলে চিনতে পেরেছেন।

লোকটা চায়ের দাম মিটিয়ে, মাথার টুপিটাকে ঠিক করতে করতে পরিমলবাবুর দিকেই এল। পরিমলবাবু পরে আছেন পাজামার উপর মোটা গরম পাঞ্জাবি। তার উপর সোয়েটার, চাদরও রয়েছে। পায়ে মোজা-জুতো, গলায় মাফলার। লোকটা আরও এগিয়ে আসায় চাদর দিয়ে মুখ আড়াল করলেন পরিমলবাবু। ঠিকই তো, এই লোকই তো বিজন! এক ঝটকায় পদবিটাও মনে পড়ে গেল। বটব্যাল নয়, পালিতও নয়, বিজনের পদবি ছিল তালুকদার। বিজন তালুকদার আর পরিমল রায় বর্ধমানের নন্দপাণি স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্লাস

সেভেনে গলায় গলায় বন্ধু ছিল। পাশাপাশি বসত তো বটেই, ভাগাভাগি করে টিফিন খেত। ছুটি হলে একটা সাইকেলে চেপে বাড়ি যেত।

এই শীতেও শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল পরিমলবাবুর! চাদরকে আরও মুখের উপর টেনে নিলেন। দেখা যেন না যায়। বিজন কি তার দিকেই এগিয়ে আসছে? সে কেন এই ধূপপুরে? কোনও ভাবে পরিমল রায়ের খবর পেয়ে পিছু নিয়েছে? প্রতিশোধ নিতে চায়?

লোকটা পাশ কাটিয়ে চলে যায় স্টেশনের গেটের দিকে। একেবারে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। পরিমলবাবুর দিকে ফিরেও তাকায় না। গুন গুন করে গানও গাইছিল যেন। পরিমলবাবু স্বাভাবিক হলেন। লজ্জাও পেলেন। কী যা-তা ভাবছিলেন! এত বছর পর বিজন কেন তাঁকে তাড়া করে এত দূর আসবে? লোকটা আদৌ বিজন তালুকদারই কি না, তারও তো ঠিক নেই। যদি সত্যি হয়েও থাকে, সে সহপাঠীকে চিনতে পারেনি মোটেও। ভয় পাওয়ার কী হয়েছে? বাহান্ন বছর আগের ঘটনা কি কেউ মনে রাখে? বিজনও নির্ঘাত ভুলে মেরে দিয়েছে। মিছিমিছি ভয় হচ্ছে। ওই লোক নিজের মতো থাকুক, দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নিলেই হবে।

খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে পরিমলবাবুও স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বাড়ি ফিরে খানিক ক্ষণ বই পড়ে, খানিক ক্ষণ রেডিয়োয় গান শুনে, খাওয়াও সারলেন তৃপ্তি করে। বিজনের কথা ভুলেই গেলেন।

বেশি রাতে ঘুম ভাঙল বিশ্রী স্বপ্নে। মনে হল, জানলার ও পাশে অন্ধকারে বিজন দাঁড়িয়ে। সেই ক্লাস সেভেনের বিজন, শুধু পোশাক আর মাথার টুপিটা বিকেলের মতো। স্বপ্নের মধ্যে ফিস ফিস করে কথা বলল সেই ছেলে।

‘অমন ভয়ঙ্কর কাজ করেছিলি কেন পরিমল? কেন করেছিলি? আমি তো তোর বন্ধু ছিলাম। বন্ধুর সঙ্গে কেউ অমন করে?’

ধড়ফড় করে উঠে বসলেন পরিমলবাবু। বুঝতে পারলেন, এত শীতেও লেপের তলায় শুয়ে তিনি ঘামছেন। অনেকটা সময় ঘুমোতে পারলেন না। এক সময়ে ঠিক করলেন, এই পাঁচ দিনে যেটুকু স্বাস্থ্য উদ্ধার হয়েছে সেটুকু নিয়েই কাল কলকাতায় ফিরে যাবেন। যে ঘটনার কথা তিনি গত বাহান্ন বছর ধরে ভুলে যেতে চেয়েছিলেন, সেই ঘটনা তাঁকে তাড়া করছে। ধূপপুর ছেড়ে চলে যেতে হবে। কাল দুপুরে কলকাতার ট্রেন রয়েছে।

কিন্তু পর দিন সকালে এমন একটা ঘটনা ঘটল যে, পরিমলবাবুকে ধূপপুর ছাড়তে হল না।

ঘুম থেকে উঠতে একটু বেলাই হল। চা খেয়ে বাজারে বেরোলেন পরিমলবাবু। দুপুরের খাবার তো লাগবেই, রাতেও ট্রেনে কিছু খেতে হবে। এটা-সেটা দেখতে দেখতে এগোচ্ছিলেন পরিমলবাবু, হঠাৎ এক জন কোট, টুপি পরা ভারী চেহারার লোক পথ আগলে দাঁড়াল। মুখ দেখে আঁতকে উঠলেন পরিমলবাবু। বিজন!

এক গাল হাসি নিয়ে লোকটা হাত বাড়াল, "আপনি যে মশাই বাঙালি এবং কলকাতা থেকে এসেছেন, কাল স্টেশনে দেখে বুঝতে পারিনি, এমন চাদর মুড়ি দিয়েছিলেন। পরে খোঁজ পেলাম, স্বাস্থ্য উদ্ধারে এসেছেন। তখনই ঠিক করেছি, সুযোগ পেলেই আলাপ করব।"

পরিমলবাবু ফ্যাকাসে মুখে হাসার চেষ্টা করলেন। বাড়িয়ে রাখা হাত ধরলেন কাঁপা হাতে। কথা বললেন ঢোঁক গিলে, "আপনিও বুঝি বেড়াতে এসেছেন?"

"ঠিক তা-ই মশাই। এই জায়গাটি অতি চমৎকার হলেও একা থেকে থেকে হাঁপিয়ে পড়ছি। গপ্পো করার লোক পাচ্ছি না। ওহ, নিজের নামটাই বলিনি। আমি প্রশান্ত মান্না। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, চাকরি থেকে অবসর নিয়ে নিজের ফার্ম খুলেছি। জন্ম, স্কুল-কলেজের বিদ্যাচর্চা, চাকরি সবই পটনায়। বছরের ক'টা দিন একা বেরিয়ে পড়ি। এখানে একটা গেস্ট হাউসে উঠেছি।"

পরিমলবাবু চমকে উঠলেন। কী নাম বলল লোকটা? ঠিক শুনেছেন? বিজন নয়?

নিজেকে সামলাতে না-পেরে পরিমলবাবু বলেই ফেললেন, "কী নাম বললেন যেন?"

লোকটি একটু অবাক হয়েই বলল, "প্রশান্ত মান্না। আপনার?"

পরিমলবাবুর বুকের উপর থেকে মস্ত পাথর নেমে গেল যেন। উফ! কী বাঁচানই না বাঁচলেন। এই লোক বিজন নয় তবে! ছি ছি, কাল বিকেল থেকে ভুল করে চলেছেন। আরে বাবা, বাহান্ন বছর আগে দেখা কাউকে চেনা যায় কখনও? এখন তো কাছ থেকে দেখে বুঝতে পারছেন, কোনও মিল নেই। বিজন এ রকম ছিলই না। পরিমলবাবু গদগদ ভাবে বললেন, "আমার নাম পরিমল রায়। পাঁচ বছর হল অবসর নিয়েছি। কলেজ কলকাতায় হলেও, পড়েছি বর্ধমানের স্কুলে। আমি একা মানুষ, এখানে এসেছি হাওয়া বদল করতে।"

প্রশান্ত মান্না বললেন, "খুব ভাল হল! যে ক'দিন থাকব, দু'জনে মিলে খানিক গল্প-গুজব হবে। সন্ধের পর বড্ড ফাঁকা লাগে। এখনও সাত দিন এখানে আছি।"

পরিমলবাবু হেসে বললেন, "আজই চলে আসুন না, এই তো একটু গেলেই যে এক তলা বাড়িটা রয়েছে, ওখানে উঠেছি। ভাল করে বাজার করে ফিরি, একেবারে রাতে খেয়ে ফিরবেন না হয়!"

প্রশান্ত মান্না বললেন, "অতিথিকে দেখে একেবারে বাজার? এ তো দারুণ মজা!"

দু'জনেই হেসে উঠলেন।

প্রথম আলাপে মনে হল, কত দিনের চেনা। এর পর থেকে দু'জনের রোজই দেখা হতে লাগল। আড্ডা হল, এক সঙ্গে বেড়ানো, খাওয়াদাওয়া হল। কত রকম যে গল্প হল, তার শেষ নেই। স্কুলের দুষ্টুমি, কলেজের লেখাপড়া, চাকরির ঝামেলা... কিছুই বাদ গেল না। দু'জনে বলাবলিও করলেন, "কে বলে, বেশি বয়সেও নতুন করে বন্ধুত্ব হয় না? এই তো আমাদের হল।"

এই ক'টা দিনে পরিমলবাবুর শরীর আরও ভাল হয়ে উঠল। মনটাও ঝরঝরে হয়েছে। 'বিজন' নামে কারও কথা তাঁর মনেই পড়ল না। তিনি নিশ্চিত হলেন, আর কোনও দিন মনেও পড়বে না।

সাত দিন শেষ হলে, প্রশান্ত মান্নাকে ট্রেনে তুলতে স্টেশনে গেলেন পরিমলবাবু। নাম না-করে বিজনের কথাটা বলেই ফেললেন।

"প্রশান্তবাবু, প্রথম দিন আপনাকে দেখে একটা মজার কাণ্ড হয়েছিল। আমার স্কুলের এক সহপাঠী ভেবে ভুল করেছিলাম।"

প্রশান্ত মান্না বললেন, "তাই নাকি! কার কথা মনে পড়ল? নামটা শুনি।"

পরিমলবাবু হেসে বললেন, “সে আছে। ভয়ও পেয়েছিলাম খুব।”

প্রশান্ত মান্না চোখ বড় করে বললেন, “ভয়! বন্ধুর কথা ভেবে ভয়? বলেন কী মশাই! মনে হয়, কোনও রহস্য আছে!”

পরিমলবাবু মুখ নামিয়ে বললেন, “সে আছে। বাদ দিন ও সব। আমি ঠিক করেছি, কালই কলকাতায় ফিরে যাব। ট্রেনের টিকিটও কেটে ফেলেছি। আপনার জন্য অভ্যেস খারাপ হয়ে গিয়েছে। এখানে আর একা ভাল লাগবে না। আবার দেখা হবে।”

ট্রেন চলে গেলে খানিকটা মন খারাপ নিয়েই বাড়ি ফিরলেন পরিমলবাবু। গেট খুলে ঢুকতেই একটা ছোট্ট প্যাকেট এগিয়ে দিল কেয়ারটেকার রামশঙ্কর।

“পোরশান্তবাবু আপনার জন্য উপ্হার পাঠিয়েছেন। উনি যে গেস্ট হাউসে ছিলেন, সেখানকার এক কর্মচারী দিয়ে গেল। ওকে বলে দিয়েছিলেন, ট্রেন টাইমের পর যেন সে আসে, তার আগে নয়।”

পরিমলবাবু হেসে ফেললেন। দেখেছ কাণ্ড! বেশি বয়সের বন্ধুটি সত্যি রসিক! আগ্রহ নিয়ে প্যাকেট খুললেন পরিমলবাবু। কী আছে?

একটা কালো মোটাসোটা ফাউন্টেন পেন। সোনালি খাপ ঝক ঝক করছে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন পরিমলবাবু। এই পেন তাঁর চেনা কি? অবশ্যই চেনা। বাহান্ন বছর আগের দেখা পেন। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় সহপাঠী শোভনের ঠিক এই রকম পেন ছিল একটা। ওটার উপর সব ছেলের লোভ ছিল। শোভন মোটে হাত দিতে দিত না। এক দিন সুযোগ পেয়ে শোভনের পেনসিল বাক্স থেকে পেনটা লুকিয়ে তুলে নিলেন পরিমলবাবু। একেবারে নিতে চাননি, খানিকটা সময়ের জন্য শোভনকে ঘাবড়ে দিতে চেয়েছিলেন মাত্র। প্রিয় পেন হারানোর শোকে ছেলেটা কী করে, দেখে মজা পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনা মারাত্মক দিকে মোচড় নিল। শোভন মাস্টারমশাইকে নালিশ করলে হইচই শুরু হয়ে যায়, খোঁজাখুজি চলতে থাকে। ঠিক হল, আশপাশের ছেলেদের ব্যাগ পর্যন্ত দেখা হবে। এতে পরিমলবাবু ভয় পেয়ে যান। কী করা উচিত বুঝতে না পেরে পাশে বসা বিজনের ব্যাগে পেনটা দিলেন ঢুকিয়ে। বিজন জানতেও পারল না। কিছু ক্ষণ পর তার ব্যাগ খুলে পেন পাওয়া গেল। মাস্টারমশাই তাকে দোষ স্বীকার করতে বললেন। বিজন রাজি হল না। পর দিন বিজনের বাবা-মাকে হেডমাস্টারমশাই ডেকে পাঠান। তখনও বিজন চুপ করে রইল। তার ব্যাগে অন্য কেউ পেনটা ঢুকিয়ে দিয়েছে কি? কাউকে সন্দেহ হয়? এই প্রশ্নেরও বিজন

মাত্র। প্রিয় পেন হারানোর শোকে ছেলেটা কী করে, দেখে মজা পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনা মারাত্মক দিকে মোচড় নিল। শোভন মাস্টারমশাইকে নালিশ করলে হইচই শুরু হয়ে যায়, খোঁজাখুজি চলতে থাকে। ঠিক হল, আশপাশের ছেলেদের ব্যাগ পর্যন্ত দেখা হবে। এতে পরিমলবাবু ভয় পেয়ে যান। কী করা উচিত বুঝতে না পেরে পাশে বসা বিজনের ব্যাগে পেনটা দিলেন ঢুকিয়ে। বিজন জানতেও পারল না। কিছু ক্ষণ পর তার ব্যাগ খুলে পেন পাওয়া গেল। মাস্টারমশাই তাকে দোষ স্বীকার করতে বললেন। বিজন রাজি হল না। পর দিন বিজনের বাবা-মাকে হেডমাস্টারমশাই ডেকে পাঠান। তখনও বিজন চুপ করে রইল। তার ব্যাগে অন্য কেউ পেনটা ঢুকিয়ে দিয়েছে কি? কাউকে সন্দেহ হয়? এই প্রশ্নেরও বিজন কোনও জবাব দেয় না। ক'দিন পর স্কুল ছেড়ে চলে যায় নিঃশব্দে।

'প্রশান্ত মান্না'র দেওয়া উপহারের প্যাকেটে শুধু পেন নয়, এক টুকরো কাগজও পান পরিমলবাবু। তাতে লেখা—

'শোভনের পেনটা সে দিন তোর নেওয়া হয়নি, আজ একটা কিনে দিয়ে গেলাম। ধূপপুরে এমন ভাল পেন পাব ভাবিনি। ভাল থাকিস। ইতি, ক্লাস সেভেনের বিজন।'

ছবি: রৌদ্র মিত্র

শিক্ষা

স্বর্ণেন্দু সাহা

স্কুলের লেখাপড়া আরম্ভ হয়ে গেছে প্রায় ঘণ্টা খানেক হল। ঘড়িতে সকাল সাড়ে সাতটা সবে পেরিয়েছে। উজ্জ্বল দিন। হঠাৎ হাকুচ কালো মেঘের একটা ছাতা জড়িয়ে ফেলল স্কুলটাকে। গভীর সন্ধের অন্ধকার নেমে এল সাত সকালেই।

শুরুতে দেখা গিয়েছিল স্রেফ একটা কালো বিন্দু। আকাশের মগডালে, স্কুলবিল্ডিংয়ের ঠিক মাথার উপরে আবির্ভূত হল কালো বিন্দুটা। ভাঁজে ভাঁজে, ঠিক একটা ফোল্ডিং ছাতার মতো সেখান থেকে খুলে খুলে এল পরত, ছড়িয়ে পড়তে থাকল চার দিকে। ঢেকে ফেলল, স্কুলকে কেন্দ্রে রেখে অবস্থান করা একশো মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তকে। শব্দ হচ্ছিল একটা। শব্দটা অদ্ভুত, তবে নতুন কিছু নয়। মুষল ধারে বৃষ্টি পড়ার সময় টিনের চাল যে-আওয়াজ করে, তেমনি একটা আওয়াজ হচ্ছিল। অথচ বৃষ্টির মতো কোনও তরল ঝরছিল না। মেঘ বলে মনে হলেও, এই ঢাকনার আচরণ সাধারণ মেঘের তুলনায় যথেষ্ট আলাদা। বিদ্যুতের চমকানি নেই, ঝলক নেই। ঠান্ডা হাওয়াও অমিল।

তবে কী এটা?

মেঘের ভিতরে আটকে পড়া স্কুলের আবহাওয়া পলকে বেশ খানিকটা ভারী হয়ে উঠল, আর্দ্রও। কেমন যেন একটা তীব্র বিষাদের ছাপ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। গুঁড়ো গুঁড়ো অন্ধকার নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে এ-দিক ও-দিক। ভ্যাপসা, দম বন্ধ করা একটা গন্ধ টের পাওয়া যাচ্ছে চার পাশে।

সেই মেঘের উটকো আয়তনের চাদর থেকে টুকরো টুকরো মেঘ

ছিটকে এল ভিতরে। আসার স্টাইলটা খানিক তুলোর বল ছুড়ে দেওয়ার মতো। ছাতার মতো মেঘের এক-একটা ভাঁজ থেকে বেরিয়ে এল দুটো করে টুকরো। প্রথমে মারাত্মক গতি নিয়ে রওনা হয়েও বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের প্রভাবে খুব আস্তে হয়ে গেল তাদের গতি। নেমে আসতে থাকল নীচে। নামার গতি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে পিচ রাস্তার সঙ্গে ব্যবধান কমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। গতি কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকৃতি বদলে ফেলল তারা। না, বদলায়নি। আসলে ভাঁজ খুলেছে আরও। নীচে নামতে নামতে তাদের অবয়বটা স্পষ্ট হচ্ছিল।

গাঢ় নীল রঙের শরীর। মুখটা তিন কোনা পটলের মতো দেখতে। সেখানে এঁটে বসে আছে অগুনতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা বর্ণের চোখ। নাক নেই। মুখগহ্বরটা দেখতে ফেটে-যাওয়া কাপড়ের সেলাইয়ের মতো। গলা বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। ধড়ের আকৃতি ষড়ভুজাকার। দুটো দীর্ঘ পেশিবহুল হাত। পেটের নীচে পা নেই। আছে এক বিরাট গোলক। গোলকের নীচ দিয়ে চলে গেছে ট্যাঙ্কের চাকার তলায় থাকার মতো পাত। গোটা শরীরে সেই পাত আটকানো।

গড়িয়ে গড়িয়ে, ভূমিতে আলগা কাঁপুনির জন্ম দিতে দিতে তারা ঢুকে পড়ল স্কুলে। সংখ্যায় মোট আট জন।

চার দিক তমসাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ায় অনেক পড়ুয়া বেরিয়ে এসেছে ক্লাস ছেড়ে। কী হচ্ছেটা কী, বোঝার চেষ্টা তাদের মনে। বিল্ডিং অল্প কাঁপছে। ভূমিকম্প সন্দেহেও একটা তাড়াহুড়োর ছাপ প্রত্যেকের চেহারায়। কাঁপছে কেন পায়ের তলার অবলম্বন, এই জিজ্ঞাসা মনে বা মুখে নিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকল সকলে হুড়মুড় করে। স্কুলে ঢুকেই প্রথম যে চওড়া করিডর পড়ে, সেখানে উপস্থিত মূর্তিমান আতঙ্করা। সেখান পর্যন্ত এসে থমকে যেতে হল পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। মুহূর্তে নিস্তব্ধ হয়ে গেল কোলাহল। কারা এই বিকট-দর্শন জীব? যেমন খুশি সাজো-র প্রতিযোগী নাকি? তা ছাড়া অন্ধকারই বা হয়ে গেছে কেন এমন?

অনুচ্চারিত প্রশ্নের একটারও জবাব দেওয়ার চেষ্টা দেখা গেল না আগন্তুকদের মধ্যে। কর্কশ, কাঠখোট্টা উচ্চারণের বাংলায় বলল ট্যাঙ্কের মতো দেখতে অবয়বরা, "সবাই চলে যাও। আমরা এসেছি এই স্থাপত্যকে ধূলিসাৎ করতে। যারা থাকবে, তারাও ধ্বংস হবে।"

"চলে যাব?" সবিস্ময়ে প্রায়-প্রতিধ্বনি করলেন কয়েক জন শিক্ষক-শিক্ষিকা।

"হ্যাঁ। এক্ষুনি।"

গুঞ্জন শুরু হল। প্রাথমিক ভয়টা কেটে গেছে ওদের। এ যেন কোনও এক মজার ব্যাপারই চলছে! আজব রকম সাজগোজ করে রবাহূতের মতো এসে হাজির হওয়া সার্কাসের দল বুঝি! আগে থেকে একটা খবর তো দেবে!

"আপনাদের পরিচয়?" ঠোঁটে ভদ্রতার আপ্যায়ন মিশিয়ে জানতে চাইলেন এক শিক্ষক।

"তোমার তা জানার দরকার নেই। বললেও মগজে ঢুকবে না।"

"বটে!"

"হ্যাঁ। সময় থাকতে দৌড়ে পালাও। এই স্কুল থাকবে না। স্কুল প্রাণীদের মাথা বিগড়ে দেয়।"

"মাথা বিগড়ে দেয়?" এক জন দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট বিদ্রুপ।

"হ্যাঁ," উত্তর এল ভারিক্কি গলায়।

"কেমন করে?" রিনরিনে কণ্ঠে জানতে চাইল এক পড়ুয়া।

ট্যাঙ্কদের মধ্যে এক জন ঠক ঠক করে হাসল, "ফালতু জিনিসপত্র শিখে লোকজন অন্যের কথা মানতে চায় না। হুকুম মানতে চায় না। তাতে সমাজের ক্ষতি। সবাই নিজের নিজের মত অনুসরণ করলে, বিভ্রান্তি তৈরি হয়।"

"চোখ বুজে নির্দেশ মেনে চলে তো বোকারা-ই।"

"আদর্শ সমাজে বোকাদেরই থাকতে হবে নিরানব্বই শতাংশ।"

"এ সব অহেতুক কথাবার্তা বলে লাভ নেই। আপনারা যে-নাটকের কোম্পানি থেকেই আসুন না কেন, এ বার বিদেয় হোন। পুলিশ ডাকব?"

ছিমছাম অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ট্যাঙ্করা। কৌতুকের চোখে খানিক দেখল ওদের। তার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই লাফ দিল এক বার। অল্প উচ্চতার লাফ। আর সেই সামান্য লাফের প্রতিঘাতেই খাদের মতো মোটা মোটা চিড় খেয়ে গেল করিডরের সিমেন্ট। এক ট্যাঙ্ক তার পেশল হাত লম্বালম্বি তুলে ধরল নিজের দেহের সামনে। হাতে আঙুল নেই, নখ নেই। ছোট ছোট স্টিল রঙের বল দিয়ে তৈরি কব্জি থেকে পাঞ্জা। একটা বল খুলে এল হাত থেকে। খুব ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যায়, সূক্ষ্ম আঁশের মতো কিছু লেগে আছে খুলে আসা বলের সঙ্গে। বলটা কয়েক সেকেন্ড প্রায় ভেসে রইল অভিকর্ষকে পাত্তা না-দিয়ে। তার পর অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ভাসতে

ভাসতে এগিয়ে গেল জমায়েতের দিকে। নিঃশব্দে ফেটে গেল। আর এক গাদা আলকাতরার মতো চিজ় প্রচুর ফোঁটা গায়ে মাখিয়ে গেল পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে। কালচে আঠালো ফোঁটা দেহের যেখানে যেখানে স্পর্শ করল, সেখানটা অবশ হয়ে গেল। যার পায়ে পড়ল, সে বাধ্য হল বসে পড়তে। যার হাতে পড়ল, তার হাত কাঁধ থেকে ঝুলে পড়ল ভেঙে যাওয়া পুতুলের হাতের মতো।

আর-এক জন একটু বাঁ-দিকে সরে গিয়ে ফুঁ দিল পাশের দেওয়ালে। মুখ থেকে ছিটকে বেরোল ছোট ছোট ধূসর রঙের কণা। সেগুলো দেওয়াল স্পর্শ করতেই বিস্ফোরণ ঘটল। ইট-বালির শক্ত দেওয়ালে বিশাল গর্ত তৈরি হয়ে গেল লহমায়।

সবাই এ বার চিৎকার করতে আরম্ভ করল। বিস্ময় ও সাহস ভেঙে বেরিয়ে আসতে লাগল ভয়ের আর্তনাদ। বড়রা যে-যার ফোন বের করে চেষ্টা করতে থাকল বাইরে যোগাযোগের। সম্ভব হল না। নেটওয়ার্ক নেই। একটুও না।

এ বার বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারছিল ওরা। থমথমে হয়ে উঠল পরিবেশ। নিস্তব্ধ একটা জাগুয়ার যেন তার বিশাল হাঁ-এর মধ্যে পুরে নিয়েছে এলাকাটাকে। ব্যাপারটা আর নিছক হাসি-মজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সত্যিই ভয়ঙ্কর কিছু প্রাণী এসে হাজির হয়েছে স্কুলে। তাদের শক্তিও অলৌকিক পর্যায়ের বিপুল। এদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তো কোনও প্রশ্নই নেই। তা হলে কি এখন পালিয়ে যাবে সবাই? মেনে নেবে ওদের হুকুম? ধ্বংস হয়ে যেতে দেবে স্কুলবাড়িকে?

॥ ২॥

সকলের অলক্ষ্যে, কখন যেন, স্কুলের পনেরোটা ঘরের প্রত্যেকটার ঘুলঘুলি দিয়ে চুঁইয়ে বেরোতে আরম্ভ করেছিল সবজে রঙের ঘন তরল, অনেকটা করে। সেই তরল ক্রমে ক্রমে বিষম রকম ঘনীভূত হয়ে রূপ নিল দশ-বারো বছরের কিশোরীদের। তাদের সকলের পরনে একই সরল ডিজ়াইনের স্কুল ইউনিফর্ম। তার রং সবুজ। দেহের ত্বক আর পোশাক ভিন্ন ভিন্ন শেডের সবুজ।

মুখে ঝলমলে হাসি ফুটিয়ে ওরা পনেরো জন দৌড়ে এল। হুবহু একই দেখতে, একই পোশাক পরা কিশোরীদের দঙ্গল এসে দাঁড়াল ট্যাঙ্ক-বাহিনীর সামনে।

“কে হে তোমরা?” একটু অবাক হয়েই যেন জিজ্ঞেস করল ট্যাঙ্করা। তাদের রিসার্চ অনুযায়ী, এই গ্রহের প্রাণীদের দেহের রং সবুজ নয়। তা ছাড়া এদের মুখের ছাঁদ একই রকম কেন? এমনটা তো হওয়ার

তা ছাড়া এদের মুখের ছাঁদ একই রকম কেন? এমনটা তো হওয়ার কথা নয়!

কোরাসে বলে উঠল সবুজ মেয়েরা, "আমরা শিক্ষা।"
"শিক্ষা?" বিস্ময় আরও বাড়ল জবাব পেয়ে।
"হ্যাঁ," কোরাসেই কথা বলছে ওরা, "আমরা শিক্ষার এক রূপভেদ। যেমন, কার্বনের রূপভেদ হল হিরে, গ্র্যাফাইট ইত্যাদি। আমরা সব স্কুলে থাকি।"
"ইয়ার্কি হচ্ছে?"
"নাহ।"

"ঝটপট চলে যাও এখান থেকে। ক্ষমতার সামান্য নমুনা দেখিয়েছি। এর পর আর তুচ্ছ ভেবে রেয়াত করব না," সজোরে হুমকি দিল ট্যাঙ্কবাহিনী।

ভয় পেল না কিশোরীরা একটুও। ফুটফুটে কণ্ঠে হাসতে হাসতে বলল, "দেখি, দেখি, আরও ক্ষমতা দেখি। দেখতে খুব ভালবাসি আমরা। তার থেকেও ভালবাসি শিখতে।"
ট্যাঙ্করা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। এত বড় স্পর্ধা এই পুঁচকি জীবদের? তারা জ্বলে উঠল কঠিন রাগে। চার দিকের আবহাওয়া তিন স্তর বেশি অন্ধকার হয়ে উঠল। খানিক শলা-পরামর্শ করে নিল তারা নিজেদের মধ্যে। তার পর উন্মাদের মতো বীভৎস হুঙ্কার ছাড়ল একটা। চিৎকারের তীব্রতায় কানে তালা লেগে গেল কারও কারও। খসে পড়ল দেওয়ালের আলগা পলেস্তারা। রুক্ষ হাওয়ার মধ্যে ছুটে বেড়াতে আরম্ভ করল রেণুর মতো ভয়।

"সতর্ক করেছিলাম," কঠোর গলায় বলল এক জন। তার কথাটা বজ্রনির্ঘোষের মতো জাপটে ধরল অঞ্চলটাকে। তার পর আট জন ট্যাঙ্ক এক যোগে ঘুরপাক খেল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। মুহূর্তে জন্ম নিল অন্ধকার আভায় জারিত এক ঝোড়ো ঘূর্ণি। আর সেই ঘূর্ণির ভিতর দিয়ে তেড়ে এল খণ্ড খণ্ড পিছল নীলাভ ইস্পাতের ছুরি। শিউরে ওঠা শব্দে, বায়ু ফুঁড়ে সে সব সবেগে এগিয়ে আসতে লাগল। মানুষদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

সবুজ মেয়েরা স্বচ্ছ কৌতূহলের চোখে চেয়ে রইল ধেয়ে আসা মারণ ছুরিদের দিকে। হাসল খিল খিল করে। নিজেদের মধ্যে হাতে হাত ছোঁয়াল। ওদের মাথার তালু থেকে নিক্ষিপ্ত হল একটা করে সাদা মলাটের বই। অল্প কিছু জ্বলন্ত পৃষ্ঠা দিয়ে তৈরি সেই বইগুলো অত্যন্ত মসৃণ ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল এগিয়ে আসা ইস্পাতের ফলাদের

মুখে। ফলাদের কচকচ করে খেয়ে ফেলল। তার পর স্বচ্ছ হতে হতে মিলিয়ে গেল অচিরে।

অসংখ্য চোখে চরম বিস্ময় ফুটিয়ে তাকিয়ে রইল ট্যাঙ্করা। এ কোন দেশি বিজ্ঞানের খেলা? এ রকম কিছুর মুখোমুখি হতে হবে, হিসেবের মধ্যে ধরা ছিল না। তাদের হাতের চামড়ায় ঢেউ খেলে গেল বিরক্তির প্রকোপে। আর ছুটকো-ছাটকা আক্রমণ নয়। এ বার চরম আঘাত করতে হবে। দেখাতে হবে দৈহিক শক্তির পরিচয়। তাদের দেহের নীচের পাত গেঁথে বসল সিমেন্টে। ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করে উঠল তারা। তাকাল কটমটে দৃষ্টিতে। তার পর আট জন ভীমবেগে ছুটে গেল ওদের দিকে। আর সেই যাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় থর থর করে কাঁপতে থাকল স্কুল। অদ্ভুত সেই প্রাণীদের নিজেদের দিকে তেড়ে আসতে দেখে আতঙ্কে জমে গেল সবাই। আসন্ন সংঘাতের আশঙ্কায় চোখ বুজে ফেলল কেউ কেউ।

ভয় পেল না কেবল সবুজ মেয়েরা একটুও। হাসি মুখে ওরা ওদের এক হাত সামনে বাড়াল। শান্ত মুখ। তৎক্ষণাৎ শূন্য থেকে এসে একটা হোয়াইট বোর্ড দাঁড়িয়ে গেল ওদের সামনে। ঝলমলে আয়তাকার এক জিনিস। সেই বোর্ডে রকমারি রঙের মার্কার পেন দিয়ে আঁকা বিজ্ঞানের বিভিন্ন চিহ্ন, ঐতিহাসিক সাল, ভৌগোলিক মানচিত্র ইত্যাদি। দেখতে না-দেখতে জ্যান্ত, ত্রিমাত্রিক সলিড হয়ে উঠল চিহ্ন ও অক্ষর। তার পর বন্যার স্রোতের মতো, দলে দলে ধেয়ে গেল ট্যাঙ্কদের দিকে। গড়নে হালকা-পাতলা সে সব চিহ্ন প্রবল অচেনা কোনও শক্তিতে রুখে দিল তাদের। থামিয়ে দিল ট্যাঙ্কদের গতি। তার পর মুহুর্মুহু আঘাত করতে লাগল নীরব নির্মমতার সঙ্গে। চিহ্নদের আঘাত গুলি বা কামানের মতো ধ্বংসাত্মক নয়। বরং ওরা পাল্টে দেয় বস্তুর অভ্যন্তরীণ কাঠামো ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য। খারাপকে পরিবর্তন করে জন্ম দেয় ভালর। ধাক্কা মারতে মারতে প্রত্যেক ভয়াল ট্যাঙ্ককে ওরা বদলে ফেলল সুন্দর ভ্যানিলা আইসক্রিমের পিণ্ডে। এই পরিবর্তন ঘটতে সময় লাগল না মোটে। সেকেন্ডের কাঁটা নয়-দাগ এগোনোর আগেই ট্যাঙ্করা হয়ে গেল নিখুঁত আইসক্রিম। থ হয়ে দেখতে থাকল সকলে এই অবিশ্বাস্য কাণ্ড। তা হলে সত্যিই কি তারা রেহাই পেল ওই কালান্তকদের থেকে?

বাইরে এখনও ঝুলছে অপার্থিব মেঘের চাদর। তার কী হবে? ওটা থাকা অবধি বিপন্মমুক্ত নয় এখনও কেউ।

সবুজ মেয়েরা লাফাতে লাফাতে, সদলবলে হই হই করতে করতে চলে গেল বাইরে। মেঘ ঝুলছে। নিকষ কালো ভয়াল ধাঁচের মেঘ। চার পাশের অবস্থা ভীষণ ম্লান ও আশ্চর্য রকমের নিঝুম। ওরা কৌতূহলের সঙ্গে দেখল মুখে হাসি মেখে। তার পর লাফ দিল। বিশাল সে লাফের সামর্থ্য। চোঁ-করে উঠতে থাকল সোজা মেঘের দিকে। সেই উঠতে থাকার সময়, ওদের এক এক জনের দেহ বদলে গেল এক একটা হালকা সবুজ রঙের চওড়া শামিয়ানায়। সে সব শামিয়ানা গিয়ে চেপে ধরল মেঘকে। মেঘও চেষ্টা করল পাল্টা যুদ্ধের। কিন্তু দাঁড়াতে পারল না একদম। ওরা বদলে ফেলল মেঘকেও, দুর্জয় স্নেহ যেমন করে বদলে দেয় হিংসাদের। করাল মেঘ পরিণত হল সাদা পেঁজা তুলোর মতো সহাস্য মেঘে। স্কুলবাড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝকঝকে রোদ। সবুজ মেয়েরা ভাসতে ভাসতে নেমে এল, হাওয়ায় ভাসতে থাকা ফুলের পাপড়ির মতো। স্কুলসুদ্ধ সবাই হাঁ-করে দেখছে ওদের। কিছু ক্ষণ নীরবতা। তার পর হাততালি দিতে থাকল সবাই। আনন্দে উদ্ভাসিত সকলের মুখ।

পনেরো জন কিশোরী এক সঙ্গে হাসল নরম মুখে। কোরাসে বলল, “মনে রাখবে, শিক্ষার শক্তি, ধ্বংসের চেয়ে অনেক বেশি।”

“কেন?” সরল মুখে জিজ্ঞেস করল এক পড়ুয়া।

“কারণ, শিক্ষাই পারে, ধ্বংসস্তূপকেও প্রাণের বাগান করে তুলতে,” উত্তর দিল সবুজ-মেয়েরা।

.

গল্প পাঠানোর নিয়মাবলি

- আনন্দমেলায় গল্প পাঠাতে হবে ডাকে কিংবা ইমেলে। পত্রিকা দফতরের রিসেপশনে এসেও গল্প জমা দিতে পারেন।
- ডাকে কিংবা দফতরে জমা দিলে গল্পটি হাতে লিখে কিংবা কম্পিউটারে কম্পোজ় করে প্রিন্ট আউট নিয়েও পাঠাতে পারেন। তবে লেখাটি মনোনীত হলে তখন কিন্তু ইউনিকোডে কম্পোজ় করা সফ্‌ট কপি পাঠাতে হবে। ইমেলে পাঠালে কিন্তু গল্পটিকে প্রথমেই ইউনিকোডে কম্পোজ় করেই পাঠাতে হবে।
- গল্পের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল/ ফোন নম্বর পাঠানো বাধ্যতামূলক।
- গল্পের শব্দসংখ্যা ১৫০০-র মধ্যে রাখাই ভাল।
- গল্পটি যেন মৌলিক হয়। অন্য কোনও গল্পের অনুবাদ কিংবা অনুসরণ কিংবা অনুকরণ হলেও চলবে না। এবং কোথাও যেন গল্পটি প্রকাশিত না হয়ে থাকে।
- ডাকযোগে গল্প পাঠানোর ঠিকানা: সম্পাদক, আনন্দমেলা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১।
- গল্প পাঠানোর ইমেল হল: anandamelamagazine@gmail.com
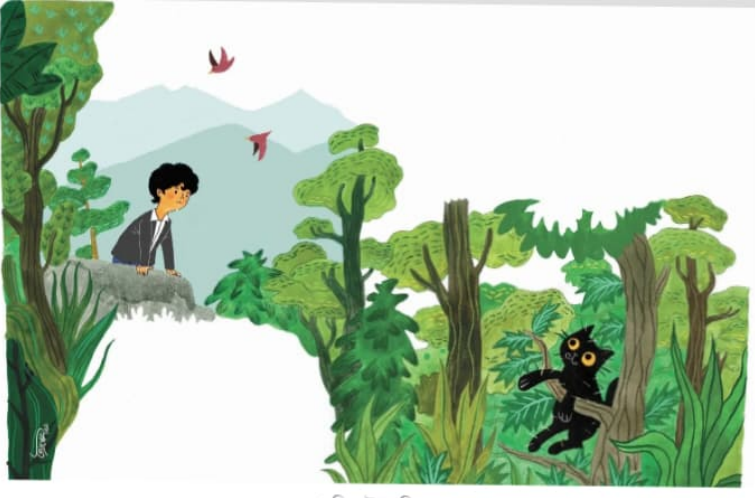
ছবি: রৌদ্র মিত্র

বিড়াল হরবোলা

অন্য ছেলে-মেয়ের মতো সে বাবা-মার কাছে এটা চাই, ওটা চাই বলে বায়না করে না কক্ষনও। সে খুব ভাল মতোই জানে যে, তার জন্যে তার মা-বাবা যা করছেন, তা তাঁদের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে উঠেই করছেন। এর বেশি চাপ দিলে, তাঁরা পারবেন কী করে!

মহুয়া সমাদ্দার

অর্কদীপ বলল, "এই শুভ, জানিস আজ কী হয়েছে?"

অর্কদীপের কথা শুনে বই গোছাতে গোছাতে তার দিকে মুখ ফেরাল একই বেঞ্চে পাশে বসা শুভ। ক্লাসের এ-দিক ও-দিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ছেলেরা। টিফিনের সময় যেমনটা হয় আর কী! অদ্ভুত কোনও কথা বলবে ভেবে নিয়েই হয়তো শুভর মুখে একটা তির্যক হাসি ফুটে উঠল।

"কী হয়েছে রে, অর্ক?"

শুভর কণ্ঠে বিদ্রুপ দেখেও, তা পাত্তা না- দিয়ে অর্ক বলে উঠল, "আমাদের পাড়ায় যে বুড়ো বট গাছটা আছে না, সে আজ খুব খুশি হয়েছে। কী আনন্দ ওর আজ!"

"ও মা! তা-ই নাকি? তা বট গাছটা তোকে সেই কথা বলল বুঝি!"

এমন শ্লেষাত্মক বক্রোক্তি শুনলে অন্য যে-কেউ দমে যেত হয়তো। কিন্তু অর্ক এতটুকুও না-দমে বলল, "বলেছেই তো।"

"তা সে কী বলল, শুনি?"

"খুব হাসছিল বুড়ো বট গাছটা, বুঝলি!"

"হাসছিল! গাছ হাসছিল! বলিস কী রে!"

অর্ক বট গাছের স্বপ্নে এতটাই বিভোর হয়ে আছে যে, সে শুভর কথা না-শুনেই বলে চলল, "আমি যেই ওর কাছে গেলাম, ও গলা ঝেড়ে বলল, 'জানো অর্কবাবু, সরকার এত দিনে একটা বুদ্ধিমানের মতো

বলল, ‘জানো অর্কবাবু, সরকার এত দিনে একটা বুদ্ধিমানের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’

“আমি তো অবাক! সে যে কোন সিদ্ধান্তের কথা বলতে চাইছে, আমি প্রথমে তার কিছুই ঠাহর করতে পারিনি। আমার হাঁ মুখ দেখে বুড়োর সে কী হাসি! তার পর ও বলল, ‘আরে, সরকার গত কাল ঘোষণা করল শোনোনি যে, এ বার থেকে শব্দবাজি ফাটানো বন্ধ করা হবে!’ আমি বললাম, ‘তাতে তোমার আনন্দের কী হল?’

“এ বার হো-হো করে হেসে উঠল সে। কিছু ক্ষণ পর হাসি থামিয়ে বলল, ‘তুমি তো ভারী বোকা ছেলে হে অর্কবাবু!’”

“এটা তোর বটবুড়ো একদম ঠিকই বলেছে,” শুভ হাসতে হাসতে বলল।

অর্ক বলে চলল, “তার পর বুড়ো বলে, ‘আরে বাবা, শব্দবাজিতে পরিবেশ কতটা দূষিত হয়, তা তুমি জানো? পরিবেশ দূষণ যত কমবে, আমরা ততই ভাল থাকব। ততই মজা আমাদের। হা হা হা!’”

“বাব্বা! বট গাছটা তোর সঙ্গে এত কথা বলল!”

শুভর প্রশ্নের কোনও উত্তর না-দিয়ে একটু আনমনা ভাবেই অর্ক বলল, “আসলে বট গাছটা বড্ড একা হয়ে গেছে জানিস! ওর পাশে যাও দু’-একটা গাছ ছিল, ঝড়ে সে ক’টাও পড়ে গেছে। তাই বেচারার কথা বলার আর সঙ্গী নেই।”

“সঙ্গী! গাছের আবার কথা বলার সঙ্গী চাই বুঝি? হা হা হা!” চোখ দুটো গোল গোল করল শুভ।

“নিশ্চয়ই চাই। জগদীশচন্দ্র বসু তো সেই কত্ত বছর আগেই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, গাছ উদ্দীপনায় সাড়া দেয়।”

“তো?”

“আরে বাবা, এ তো সহজ হিসেব। যে উদ্দীপনায় সাড়া দেয়, তার বন্ধু ছাড়া চলে?”

“তা ঠিক, তা ঠিক,” বিড় বিড় করতে করতে শুভ উপর-নীচে মাথা দোলাতে লাগল। এমন সময় ঋক শুভর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, “কী রে শুভ, অমন ভাবে মাথা দোলাচ্ছিস কেন রে? কী হয়েছে কী?”

এ বার আর হাসি না-চেপে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল শুভ। হাসতে

হাসতেই সে বলে উঠল, "আরে, আমাদের অর্ক পাগলাটা কী বলছে, শোন!"

ঋকসহ আনন্দ, উজান, দীপ্তেশ, ঈশান সকলে এক সঙ্গে হই হই করে বলে উঠল, "কী বলছে পাগলাটা? বল বল, শুনি! আমরাও শুনতে চাই ওর প্রলাপ।"

ওদের থেকে এক সঙ্গে এমন তিরস্কার পেয়ে কেমন যেন গুটিয়ে গেল অর্ক। সে মাথা নিচু করে দাঁত দিয়ে নখ কাটতে লাগল। আর শুভ রসিয়ে রসিয়ে বলতে লাগল,

"আমাদের অর্ক পাগলা নাকি আজকাল গাছের সঙ্গে কথা বলছে!"
"কিসের সঙ্গে! গাছের সঙ্গে! হা হা হা!" ঋক দুলে দুলে হাসতে লাগল।
ঋকের হাসির সঙ্গে গলা মিলিয়ে সবাই এক সঙ্গে জোরে হেসে উঠল।
"পাগলাটা তো দিন কে দিন পুরো উন্মাদ হয়ে চলেছে।"

দীপ্তেশের কথায় সবাই সহমত হল। এ সব দেখে আজকাল অর্কর মনে হয়, স্কুলে বা বাড়িতে তার উপস্থিতি যেন অপ্রয়োজনীয়।

কোনও উত্তর না-দিয়ে অর্ক ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে এল। অর্ক অর্থাৎ অর্কদীপ চৌধুরী সোনারগাঁও মিশনারি স্কুলে ক্লাস এইটের ছাত্র। একটু কল্পনাপ্রবণ বলে, তার ক্লাসের অন্য ছেলেরা বরাবরই তাকে হ্যাটা করে। ছেলেদের এ সব কাজে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য উস্কে দেয় ঋক। এলাকার নেতা পরমজিৎ উপাধ্যায়ের এক মাত্র সন্তান ঋক। সেই কারণেই সে নিজেকে জাহির করতে কখনওই পিছপা হয় না। লেখাপড়ায় সে বিশেষ ভাল না-হওয়া সত্ত্বেও ছেলেরা তাকে বেশ মান্য করে চলে, তার বাবার প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্যে। ঋকও সে কারণে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। ঋকের আর-একটা স্বভাব হল, কারও কাছে কোনও ভাল জিনিস দেখলে, সেটা সে নিজের দখলে আনতে চায়। সে ছলেই হোক, বলেই হোক বা কৌশলেই হোক। লেখাপড়ায় রীতিমতো ভাল হওয়া সত্ত্বেও অর্কর বাবা সামান্য ক্লার্ক হওয়ার কারণে ঋক তাকে বেশ করুণাই করে। আর সে জন্যেই পাগল না-হয়েও 'পাগলা' তকমা নিয়ে অর্ক প্রতিবাদ করে না। এড়িয়েই যায়।

পায়ে পায়ে স্কুল ক্যাম্পাসে এসে দাঁড়িয়েছে অর্ক। এই সময় রোজই নাইন-টেনের ছেলেরা কোর্টে ব্যাডমিন্টন খেলে। সে একা-একা দাঁড়িয়ে দেখেও কখনও-সখনও। আজ তার খেলা দেখতে ইচ্ছে

করছে না। সে স্কুল ক্যাম্পাসের এক পাশে থাকা কৃষ্ণচূড়া গাছের তলার বেদিতে এসে বসল। মনটা খুবই খারাপ লাগছে তার। কাঁহাতক এই অপমান সহ্য করা যায়! সে বসে পড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই গেট টপকে সকলের নজর এড়িয়ে কী ভাবে যেন ঢুকে পড়া একটা কুকুর বার দুই ঘেউ ঘেউ করে উঠল। অর্ক টিফিন বক্স থেকে দুটো বিস্কুট বের করে দিতেই কুকুরটা চুপ করে গেল। কুকুরের ডাকের অর্থ সে বেশ ভাল মতোই বুঝতে পারে। ঋকরা তো এ সব কথা জানেই না। এই যেমন এক্ষুনি কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে বলছিল, 'বড্ড খিদে পেয়েছে। কেউ একটু খেতে দাও।'

আর তাই তো অর্ক তাকে খেতে দিতেই, সে কেমন চুপ করে গেল!

এই তো গত শনিবার তাদের ফ্ল্যাটের সামনে একটা বিড়াল মিউ মিউ করে কাঁদছিল। পড়া থামিয়ে একটু মন দিয়ে বিড়ালের ডাকটা শুনতেই সে বুঝতে পারল বিড়ালটা বলছে, 'উফ! কী কষ্ট! পায়ের কাঁটাটা বের না-করলে আর বাঁচবই না ব্যথায়।'

অর্ক সঙ্গে সঙ্গে এক ছুটে বাইরে এসে দেখে, সত্যিই বিড়ালটার ডান পায়ের পাতার তলার নরম অংশের ঠিক উপরে একটা কাঁটা ঢুকে রয়েছে। অর্ক সঙ্গে সঙ্গে কাঁটাটা তুলে দিতেই, বিড়ালটা একটু হেসে তাকে মিউ মিউ করে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে চলে গেল। তার পর থেকে বিড়ালটার সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছে, তখনই সে মিউ মিউ করে বলে, 'কী গো ছেলে, কেমন আছ তুমি?'

অর্ক 'ভাল আছি' বলে চলে যায়। এ সব কথা ঋকরা শুনলে কায়দা করে স্কুলছাড়া করেই ছাড়বে তাকে। কিন্তু সে তো মিথ্যেবাদী নয়! সে যে সত্যিই পশু-প্রাণীর কথা বুঝতে পারে! গাছ, পশু-পাখি সকলের কথা সহজেই বুঝে যায় সে। তবে ওরা বোঝে না কেন তাকে? কেন ওরা অবিশ্বাস করে? কেন ওরা ভাবে যে, মিথ্যে কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছে?

অর্কর খুব চিন্তা হচ্ছে আগামী কালের এক্সকারশন নিয়ে। আগামী কাল তাদের স্কুল থেকে এইট-নাইন-টেনের ছেলেদের সোনারগাঁও থেকে বাসে করে পুরুলিয়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যদিও পাহাড় খুবই প্রিয় অর্কর, কিন্তু তার কেমন যেন একটু ভয় ভয় করছে। ঋকের মতো বদ মতলব খুব কম মানুষের মাথায় দেখেছে অর্ক। সেই কারণেই তার ভয়। পাহাড়ে ওঠার কিংবা নামার সময় ঋক উত্যক্ত করে তাকে কোনও বিপদে ফেলবে না তো? কোনও ক্ষতি করতে

চাইবে না তো তার?

(২)

ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ অর্ক স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে উঠে সামনের দিকে জানলার পাশে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে বসে পড়ল। এখনও ঋক, দীপ্তেশরা এসে পৌঁছোয়নি। মিনিট দশেক বাদে দীপ্তেশ এসে তাকে জানলার পাশে বসা দেখে বলল, "এই, তুই এখানে বসে কী করছিস রে? ওঠ! ওঠ বলছি!"

অর্ক নিরীহ মুখে চেয়ে রইল তার দিকে। ঠিক সেই সময় ঋক সহ আরও কয়েকটা ছেলে বাসে উঠল। ঋক তার দিকে এগিয়ে এসে বলল, "কী ব্যাপার দীপ্তেশ? পাগলটা এখানে বসে কী করছে? তুই বলিসনি, জানলাগুলো আমরা আগেই বুক করে রেখেছি?"

দীপ্তেশ আরও কিছুটা উঁচু গলায় বলল, "বললাম তো!"

"তা হলে? ও এখনও এখানে কী করছে?" বলেই অর্কর জামা খামচে ধরল ঋক। কিন্তু এর বেশি এগোনোর আগেই বাইরে থেকে চেঁচামেচি শুনে সন্তোষ স্যর এর মীমাংসা করলেন।

স্যর বললেন, "অর্ক যখন আগে এসে বসেছে, তখন সিটটা অর্করই প্রাপ্য। তোমরা অন্য সিটে বসে পড়ো।"

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ঋক অর্কর সোজাসুজি একটা জানলার পাশের সিট থেকে আনন্দকে সরিয়ে দিয়ে নিজে বসল। মনে মনে আনন্দ ক্ষুণ্ণ হয়েছে কি না, বোঝা গেল
না যদিও।

ঋক যে তার পর থেকেই অর্ককে অপদস্থ করার জন্যে ঘুঁটি সাজাচ্ছে, সেটা বোঝা গেল কিছু ক্ষণ পরেই। গলসির কাছাকাছি বাস আসতেই সকলকে জলখাবার সার্ভ করা হল। কড়াইশুঁটির কচুরি, আলুর দম, জয়নগরের মোয়া আর দুটো করে নলেন গুড়ের রসগোল্লা। অর্ক তার শেষ রসগোল্লাটা সবে মুখে পুরেছে, এমন সময় মাইক্রোফোনে ঋকের অ্যানাউন্সমেন্ট শোনা গেল। সাতটা দলে ভাগ করে গানের লড়াই খেলার আয়োজন করেছে সে। বেশ কিছু ছেলের আবদারে গান অথবা কবিতা আবৃত্তির অপশন রাখা হল। শব্দের শেষ অক্ষর দিয়ে গান করতে হবে অথবা কবিতা বলতে হবে। ঋকের কথায় সবাই আনন্দে হই হই করে উঠল। অর্ক এতটা পথ নিঃশব্দে জানলার বাইরের সবুজ প্রকৃতি, বাড়ি-ঘর, মাঠে বাঁধা গরু-ছাগল, রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হাঁস-মুরগি ইত্যাদি দেখছিল। তার সঙ্গে

দেখছিল সূর্যের উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির একটু একটু করে বদলে ফেলা রং।

ঋক যে শুধু তাকেই জব্দ করার জন্যেই এই পন্থা নিয়েছে, তা বোকা হলেও বেশ ভাল মতো বুঝতে পেরেছে অর্ক। তাদের ক্লাসের সব ছেলেই জানে যে, গানটা তার ঠিক আসে না। কিন্তু সবাই যখন ঋকের প্রস্তাবে সায় দিয়েছে, তখন আর তার কিছুই করার নেই। তার পাশে বসা নাইনের দুটো ছেলে এবং তাদের পিছনের সিটের আর তিনটে ছেলেকে তার দলে দেওয়া হল। মোট সাতটা টিম হয়েছে। এ-দিক ও-দিক ছড়িয়ে বসা স্যারেরা হলেন অবজার্ভার। প্রশান্ত স্যর একটা কাগজে পয়েন্ট লিখতে বসেছেন। ঋক জেনে-বুঝেই ছ'জন খেলাধুলোয় তুখোড় অথচ গানের গ-ও না জানা ছেলেকে তার টিমে দিয়েছে। নিয়ম অনুসারে যে দল সবচেয়ে কম স্কোর করবে, তাদের শাস্তি হিসেবে কিছু কিছু কাজ যেমন জলের বোতল, শুকনো খাবার ইত্যাদি ট্রেকিংয়ের সময় বইতে হবে। শাস্তি এড়ানোর জন্যে সকলেই মরিয়া হয়ে খেলছে। মাইক্রোফোন এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়াচ্ছে। অর্ক রবি ঠাকুরের দুটো কবিতা বলার পরেও তাদের টিমই পিছিয়ে রইল। শেষ প্রশ্ন এল তাদের কাছে। 'জ' দিয়ে গান অথবা কবিতা বলতে হবে তাদের। 'জ' দিয়ে যাও বা দু'-একটা গান তাদের মাথায় এসেছিল, সব গানই এর আগে কোনও না-কোনও টিম গেয়ে ফেলেছে। তাই সে সব গান গাওয়ার আর কোনও উপায় তাদের রইল না। সোমনাথ স্যর ওয়ান, টু, থ্রি করে টাইম কাউন্টডাউন শুরু করেছেন। যখন তিনি নাইন গুনছেন, তখনই নিরুপায় হয়ে অর্ক একটা কবিতা বলা শুরু করল। কবিতার নাম, 'জল-কথা'।

"জল মানে কী? জল মানে কী? বলতে পারো তুমি?
জল ছাড়া এই পৃথিবীটা আস্ত মরুভূমি।
জল মানে যে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের জোড়া।
জলের মাঝে বৃষ্টি দেখি নয় তারা আনকোরা।
জলের সাথেই গাছপালারা দারুণ সবুজ, নরম।
নইলে শ্রাবণ ব্যর্থ হবে শুধুই দহন, গরম।
জলের জন্য সমুদ্র আর নদীর ছড়াছড়ি।
জল ছাড়া আর কোথা থেকে সাধের ইলিশ ধরি?
জলের মাঝে জীবন মিশে, জীবন মাঝেও জল।
কৃষক, লাঙল, বৃক্ষ ছাড়াও মিথ্যে ফলাফল।
জলকে বাঁচাও, জলকে বাঁচাও, রক্ষা করো তুমি

নইলে যে সব ব্যর্থ হবে, সবটা মরুভূমি।”

কবিতা শেষ হতেই নাইনের ছেলেরা হাততালি দিয়ে উঠল। কবিতাটা এর আগে কখনও শোনেননি বলে বাংলার সোমনাথ স্যর জিজ্ঞেস করলেন, “হ্যাঁ রে অর্ক, কবিতাটা কার লেখা রে? এর আগে শুনেছি বলে তো মনে হচ্ছে না!”

কথাটা লুফে নিয়ে ঋক চেঁচিয়ে উঠল, “হবে না। হবে না। প্রখ্যাত কবির কবিতা ছাড়া কোনও কবিতা চলবে না।”

প্রশান্ত স্যর হঠাৎ রেগে উঠে কড়া চোখে চাইলেন ঋকের দিকে, “না ঋক। এটা ঠিক নয়। আমরা খেলা শুরুর আগে এ রকম কোনও নিয়ম বলিনি যে, কোনও অপরিচিত কবির কবিতা বলা যাবে না।”

সোমনাথ স্যর চোখ বুঝে কী যেন ভাবতে চেষ্টা করে তার পর বললেন, “কী রে অর্ক, বললি না তো কবিতাটা কার লেখা!”

অর্ক কিছু ক্ষণ আমতা আমতা করে বলল, “আসলে স্যর, কবিতাটা...” এই পর্যন্ত বলেই সে থেমে গেল। ভয়ে তার গা-হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। ঝোঁকের মাথায় কবিতাটা না-বললেই ভাল হত। লজ্জায়, অপমানে থর থর করে কাঁপছে সে।

ঋক ঝোপ বুঝে কোপ মারতে সময় নিল না এতটুকুও। লাফিয়ে উঠে বলল, “বুঝেছি স্যর। এ নিশ্চয়ই আমাদের অর্কই লিখেছে। এমন বিদঘুটে লেখা, তায় আবার বাংলায়, ওর মতো খ্যাপা ছাড়া আর কে-ই বা লিখতে পারবে স্যর!”

ক্লাস এইটের যে-ক'জন ছেলে তাদের বাসে রয়েছে, তারা সবাই হো হো করে হাসছে ঋকের কথায় মজা পেয়ে। এ বার অর্কর লজ্জায় মরেই যেতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে সোমনাথ স্যর বলে উঠলেন, “এই চুপ করো! চুপ করো সবাই!”

তার পরেই প্রশান্ত স্যর অর্কর দিকে ফিরে বললেন, “এই অর্ক, ঋক যা বলছে, সত্যিই তা-ই? তুমিই লিখেছ এমন কবিতা?”

অর্ক এ বারও নিশ্চুপ। ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ কোনও উত্তর দিচ্ছে না দেখে সোমনাথ স্যর বললেন, “তোমার লেখা এই কবিতাটার একটা প্রিন্ট আউট দিয়ো তো অর্ক। এই কবিতাটা দিয়েই ‘সেভ ওয়াটার’ প্রোজেক্টের নতুন ক্যাম্পেন শুরু করব। ওই ভাবনার সঙ্গে তোমার এই কবিতাটা বেশ যাবে মনে হচ্ছে।”

স্যারেদের প্রশংসা শুনে কেমন যেন একটু দমে গেল ঋক। তার পর থেকে সে আর-একটাও কথা বলেনি বিশেষ।

পৌনে এগারোটা নাগাদ বাস পুরুলিয়ায় পৌঁছোল। সিরকাবাদ থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে অযোধ্যা পাহাড়ে পৌঁছোতে আরও ঘণ্টা খানেক সময় লাগল। বাস থেকে নেমে প্রশান্ত স্যর জানালেন, কেশরগড়ের মহারাজ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে পুরুলিয়ার সম্পদ হস্তগত করেছিলেন।

রাকাব ফরেস্ট, যেটা কিনা আগে কাশীপুরের হান্টিং প্লেস হিসেবে পরিচিত ছিল, সেটাই তারা আগে দেখে নিল ঝটপট করে। তার পর কংসাবতীর তীরে ডোলাংগা পিকনিক স্পটে লাঞ্চ করে অযোধ্যা পাহাড়ে ওঠার জন্যে তৈরি হয়ে এগিয়ে চলল সবাই। অর্ক মনে মনে খুবই উত্তেজিত। এই সব পাহাড় মানেই কত অজানা গাছ-গাছালি থাকবে! গাছেদের মনের কত অজানা কথা জানা হবে তার! ইস! এমন একটা পাহাড় যদি তাদের সোনারগাঁওয়ে থাকত! কী মজাই না হত তা হলে!

পাহাড়ে ওঠার সময় সন্তোষ স্যর সবাইকে বললেন, অযোধ্যা পাহাড় ছোটনাগপুর মালভূমির একেবারে পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এটি পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অংশ বিশেষ।
কাছে যে গাছই পাচ্ছে, এক বার করে ছুঁয়ে দেখতে বড্ড মন চাইছে বলে বেশ ধীরেই চলছে অর্ক। অনেকটা আগে ঋকরা চলছিল এত ক্ষণ। কিন্তু এখন সে দীপ্তেশ আর আনন্দর সঙ্গে কী যেন ফিস ফিস করে তাদের চলার গতি কমিয়ে দিল হঠাৎ করে। ফলে অর্ক এত আস্তে চলার পরেও তাদের ধরল এবং ছাড়িয়ে এগিয়েও গেল। হঠাৎ পিছন থেকে আসা একটা ধাক্কায় একটা এবড়ো-খেবড়ো পাথরের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল অর্ক। ওর পাশেই দীপ্তেশ এবং ঋকও পড়ে গেল। ওদের ভাবটা এমন যেন, এমনিই গল্প করতে করতে এ-ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। কিন্তু অর্ক বেশ বুঝতে পারল যে, এ ঋকের প্রি-প্ল্যানড ধাক্কা। এই কারণেই পিছিয়ে পড়েছিল ওরা। কোনও রকমে উঠে দাঁড়িয়ে অর্ক বুঝল তার হাঁটু কেটে রক্ত বেরিয়ে গেছে। তাই এ বার হাঁটতেও তার বেশ কষ্ট হচ্ছে। ও দিকে ঋকরা যেমন করে হঠাৎ-ই পিছিয়ে পড়েছিল, এখন আবার তেমনি করেই জোর পায়ে হেঁটে অন্য ছেলেদের কাছে পৌঁছেও গেছে। ধীরে ধীরে অর্কর সঙ্গে দলের অন্যদের দূরত্ব বেড়ে চলেছে। সে কি পারবে অন্য ছেলেদের দলের কাছে পৌঁছোতে, এই ভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে?

(৩)

চার পাশে শাল-মহুয়ার ছড়াছড়ি। আর রয়েছে কিছু অজানা গাছ। মহুয়া ফুলের গন্ধে চার দিক ম ম করছে। স্কুলের ছেলেদের দলের একটা গুঞ্জন, চেঁচামেচি ভেসে আসছে বেশ কিছুটা দূর থেকে। সেই আওয়াজ অনুসরণ করেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলেছে অর্ক। এর আগে রাঁচিতে এমন পাহাড় আর গাছ সে দেখেছে। উফ! কী অসাধারণ সেই অভিজ্ঞতা! কিন্তু সে-ও তো প্রায় বছর দুই আগের কথা। তার পর থেকে কলকাতার মধ্যেই কেটে গেছে। আর কোথাও যায়নি। যাবেই বা কী করে! ক'টা টাকাই বা মাইনে পায় তার বাবা সিদ্ধার্থ! ওই সামান্য মাইনে দিয়ে অর্কর স্কুলের আজ এটা চাই, কাল ওটা চাই এ সব ফিরিস্তি সামলে, সংসার চালিয়ে মাসের শেষে চোখে অন্ধকার দেখে বাবা।

এটা বেশ ভাল মতোই বোঝে অর্ক। তাও তো স্কলারশিপে স্কুলের খরচ চালাচ্ছে। নইলে তাদের মতো ঘরের ছেলেদের পক্ষে সোনারগাঁও স্কুলের মতো স্কুলে পড়া, দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্য ছেলে-মেয়ের মতো সে বাবা-মা'র কাছে এটা চাই, ওটা চাই বলে বায়না করে না কক্ষনও। সে খুব ভাল মতোই জানে যে, তার জন্যে তার মা-বাবা যা করছেন, তা তাঁদের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে উঠেই করছেন। এর বেশি চাপ দিলে, তাঁরা পারবেন কী করে!

অন্য বাচ্চাদের মতো সে কম্পিউটার গেম খেলে না। বরং অবসর সময়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে মা অনন্যার হাতে-লাগানো ফুল গাছ, তুলসী গাছদের সঙ্গে কথা বলে। ভাগ্যিস বলে! নইলে সে তো জানতেই পারত না, গাছেরাও কত কষ্ট বয়ে বেড়ায়! ওই সব ছোট ছোট গাছের বুকেই যদি অত পরিমাণ কথা জমে থাকতে পারে, তা হলে এই সব মনুষ্যবিহীন পাহাড়ি বিশালাকার গাছগুলো কত পরিমাণে কথা জমিয়ে রাখে! একটা বড় দীর্ঘশ্বাস অর্কর বুক চিরে বেরিয়ে এল।

হাঁটুটা বড্ড টন টন করছে। একটু ফার্স্ট-এড পেলে খুবই ভাল হত। সন্তোষ স্যারের হাতে একটা ফার্স্ট এডের বাক্স দেখতেও পেয়েছে সে। কিন্তু ওদের কাছে পৌঁছোতে পারলে তো ওষুধ পাবে! দু'হাত বাড়িয়ে গাছেদের পাতা, কাণ্ড ছুঁতে ছুঁতে এগিয়ে চলেছে সে। নীচের দিকে চাইতেই এক সময় বুঝতে পারল, হাঁটতে হাঁটতে সে অনেকটাই উপরে উঠে পড়েছে। হাঁটুর ব্যথায় এক এক বার তার মনে হচ্ছে যে, সে নীচে নেমে যায়। কিন্তু এত দূর এসে ফিরে

যাওয়ার কোনও মানেই হয় না। পরে এর জন্য তারই অনুতাপের শেষ থাকবে না। তাই সে হাঁটুর ব্যথাকে উপেক্ষা করেই এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

এ বার একটা বড় পাথরের চাঁই পার হতে হবে। অর্ক চাঁই-এর উপর ডান পা-টা সবে মাত্র তুলেছে, এমন সময় একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেল। সে তার চলা থামিয়ে এ-দিক ও-দিক চাইতে লাগল। নাহ! কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। এ বার সে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে পড়ল। শব্দটা কী, তা তাকে জানতেই হবে। মিনিট দুয়েক কান পাততেই সে পরিষ্কার শুনতে পেল একটা বিড়ালের কণ্ঠস্বর। কানকে আরও একটু সজাগ করতেই সে বুঝতে পারল একটা বিড়াল কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'সাহায্য করো। একটু সাহায্য করো আমায়। কে কোথায় আছ, একটু সাহায্য করো আমায়।'

আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে এটা একটা বাচ্চা বিড়ালের আওয়াজ। কিন্তু এই পাণ্ডব-বর্জিত এলাকায় বিড়াল এল কোথা থেকে! আরও বেশ কিছুটা সময় দাঁড়ানোর পরে সে বুঝতে পারল, আওয়াজটা তার বাঁ-পাশের ঝোপের মধ্যে থেকে আসছে। তার বাঁ দিকটা ঝোপ-জঙ্গল আর আগাছায় ভর্তি। এ দিকটায় সাধারণত লোকে যাতায়াত করে না। কিন্তু বিড়ালের গলায় এমন কাতর, অসহায় আর্তি শুনেও মুখ ফিরিয়ে সে চলে যাবেই বা কী করে? এত নির্দয় সে হবে কী ভাবে? নিজের সঙ্গে নিজে বেশ কিছু ক্ষণ যুদ্ধ করে যখন কোনও কূল-কিনারা পেল না, তখন পাশের একটা গাছের মোটা ডাল ভেঙে নিয়ে খুব সাবধানে বাঁ দিকের পথ ধরল। ঝোপ-জঙ্গল পার হতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে তাকে। ও দিকে বিড়ালটার ডাক ক্রমশই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। সে আরও কিছুটা এগিয়ে আসতেই দেখল ঝাঁটির ঝোপের পাশে কাঁটা গাছের একটা ডালের উপরে একটা ছোট্ট কালো রঙের বিড়ালের বাচ্চা পড়ে রয়েছে। আর ছানাটা ওই কাঁটাময় পরিবেশ থেকে বের হওয়ার জন্যে আকুল ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। কাঁটার আঘাতে বিড়ালটার শরীরের কয়েকটা জায়গায় আঘাতও লেগেছে বেশ।

আহা রে! এত ছোট্ট প্রাণীটা কী ভীষণ অসহায় হয়ে পড়ে আছে এই বিচ্ছিরি জঙ্গলে! বুকের মধ্যে চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল অর্ক। কাঁটার মধ্যে থেকে বিড়ালটাকে তুলতে গিয়ে ওর হাতের বেশ কয়েক জায়গায় আঁচড় লাগল। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে মাথায়-গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিতেই বিড়ালটা চোখ বুজে আরাম খেতে খেতে

বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ।'

বিড়ালটাকে কোলে নিয়ে ঝোপ-ঝাড় পার হয়ে আবার সেই আগের জায়গাতেই ফিরে এল অর্ক। তাদের স্কুলের অন্য ছেলেদের গুঞ্জন শোনার চেষ্টা করতেই সে বুঝতে পারল, এই সময়ের মধ্যেই ছেলের দল দূরত্ব আরও বাড়িয়ে এত দূর চলে গিয়েছে যে, তাদের আওয়াজ আর শুনতে পাওয়াই যাচ্ছে না।

পাথরের চাঁই টপকে সেই পথেই আরও কিছুটা এগিয়ে যেতেই সে দেখল, পথটা সামনে তিন দিকে বেঁকে গেছে। তিনটি দিকেই মানুষ চলাচলের চিহ্ন স্পষ্ট। এ বার সে কী করবে! কোন দিক দিয়ে গেলে সে তার বন্ধুদের খুঁজে পাবে! অর্ক জানে, এই সব পাহাড়ি রাস্তায় হারিয়ে যাওয়া খুবই সহজ। সব পথই একই রকম মনে হয় বলে পথ হারানোর পরে পথ খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন কাজ। সে বেশ কিছু ক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইল তিন রাস্তার মোড়ে। এমন সময় লক্ষ করল তার কোলে থাকা বিড়ালের বাচ্চাটা কোল থেকে নামার জন্যে কেমন যেন ছটফট করছে। অর্ক কিছুই বুঝতে পারছে না। কী হয়েছে ওর? কাটা জায়গায় কি জ্বালা করছে? বিড়ালটা এমন করছে কেন! কী চাইছে ও! হঠাৎ সে শুনতে পেল, বিড়াল ছানাটা মিউ মিউ করতে করতে বলছে, 'নীচে নামাও। নীচে নামাও আমায়। আমি জানি তোমার বন্ধুরা কোন পথে গেছে।'
অর্ক অবাক হয়ে কোল থেকে ওকে পথের উপর নামিয়ে দিল। তার পর সে অবাক হয়ে দেখল, বিড়ালটা মাঝের পথ বরাবর চলতে শুরু করেছে। চলতে চলতে সে প্রায়ই পিছন ফিরে অর্ককে দেখে নিচ্ছে। তার মুখের ভাব এমন যে, অর্ক আবার তাকেও হারিয়ে না ফেলে! এ বার তার একটু হাসিই পেয়ে গেল। নিজে বাচ্চা হয়ে বিড়ালছানাটা কী ভাবছে, যে তার পিছনে আসা মানুষটাও আর-একটা বাচ্চা! হা হা হা!

হাঁটুর ব্যথা সত্ত্বেও বিড়াল-বাচ্চাটার পিছু পিছু সে বেশ জোরে জোরেই পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল। দেখাই যাক, বিড়ালটা কোনও বিশেষ ক্ষমতাবলে বুঝতে পেরেছে কি না, তার বন্ধুরা ঠিক কোন দিকে রয়েছে! বেশ কিছুটা উপরে ওঠার পরে ছেলেদের তীব্র কোলাহল ভেসে এল তার কানে। এ বার সে নিশ্চিত হল। যাক! তার মানে সে ঠিক পথেই এগোচ্ছে। এমন সময় বিড়ালছানাটা তার পায়ের কাছে এসে কুঁই কুঁই করতে লাগল। অর্থাৎ পথ দেখিয়ে সে তার দায়িত্ব শেষ করেছে। এ বার তাকে কোলে নিয়ে চলো। অর্ক হেসে তাকে কোলের মধ্যে নিয়ে নিল। তার পরেই বিড়ালটা আবার

মিউ মিউ করে উঠল। অর্ক যেহেতু বিড়াল-কুকুরের ভাষা সহজেই বুঝতে পারে, তাই সে বুঝতে পারল বিড়ালটা একটু জল খেতে চাইছে। তার তেষ্টা পেয়েছে।

কিন্তু জল বা খাবার কিছুই নেই তার কাছে। ক্লাস টেনের কয়েকটা ছেলেকে কয়েকটা সিল করা জলের বোতল আর কিছু শুকনো খাবার নিতে দেখেছে সে। বিড়ালটাকে নিয়ে এগিয়ে চলল অর্ক। আরও বেশ কিছুটা উঠতেই সে দেখল বাকি ছেলেরা পাহাড়-জয়ের আনন্দে হই হই করছে। কয়েক জন আবার হাতে করে নিয়ে আসা পতাকা পাথুরে মাটিতে পুঁতে দিচ্ছে। বিড়ালছানাটা মিউ মিউ করে উঠল।

(৪)

ঘড়িতে ঠিক পাঁচটা বাজে। বাসের চাকা সবে গড়াতে শুরু করেছে। হঠাৎ ঋক এবং তার কয়েক জন সাঙ্গোপাঙ্গ কী যেন একটা দেখে হই হই করে চেঁচিয়ে উঠল। স্যারেরা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলেন না। ড্রাইভার আগুন লেগেছে বা ওই জাতীয় কিছু গোলমাল হয়েছে ভেবে সশব্দে ব্রেক কষে দিল। দাঁড়িয়ে পড়ল বাস। তাদের বাসের পিছনে তাদেরই স্কুলের আরও তিনটে বাস দাঁড়িয়ে পড়ল একই সঙ্গে। সন্তোষ স্যর বাসের আধো-আলোতেই এক লাফে ঋকের কাছে চলে এলেন। উত্তেজিত গলায় বলে উঠলেন, "কী হয়েছে ঋক? তোমরা এ ভাবে চেঁচাচ্ছ কেন? চুপ করো। শান্ত হও!"

ঋক হাউমাউ করে যে কী বলল, তার কোনও মর্মার্থ বোঝাই গেল না। সে বড় বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছে বুঝতে পারল সবাই। তখন আনন্দ উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে-সুস্থে জানাল, প্রথমে তারা খেয়াল করেনি... কিন্তু পরে তারা বুঝতে পেরেছে, অর্ক পাহাড় থেকে একটা কুচকুচে কালো রঙের কী-একটা আজব প্রাণী ধরে নিয়ে এসেছে। তারা সেই অজানা প্রাণীর জন্যে খুবই ভয় পাচ্ছে। তাদের ধারণা, রাত আরও বাড়লে অর্ক নিশ্চয়ই ওই প্রাণীটা দিয়ে তাদের ভয় দেখাবে।

সারা বাসে কথাটা চাউর হয়ে যেতেই চাপা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। প্রশান্ত স্যরও এরই মধ্যে তার কাছে ছুটে এসেছেন। ছেলেরাও এ দিক ও দিক থেকে ছুটে আসতে লাগল অর্কর দিকে। সন্তোষ স্যর উঁচু গলায় বললেন, "তোমরা চুপ করে নিজের জায়গায় বসো। আমরা বিষয়টা দেখছি। অর্ক..."

অর্ক ও দিকে শীতের মধ্যেও ঘামছে দর দর করে। কী হবে এ বার!

কী করে রক্ষা করবে বাচ্চাটাকে! স্যরেরা যদি তাকে আদেশ দেন বিড়ালটাকে বাইরে রেখে আসতে হবে? যদি ওঁরা বলেন যে, বিড়ালটাকে নিয়ে একই বাসে যাওয়া চলবে না, তা হলে?

বিড়ালটার সঙ্গে সারা দিন এক সঙ্গে থেকে এবং কথা বলে সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে যে, বিড়ালটার এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই। জন্মের সময়েই ওর মা মারা গেছে। সে আর আরও একটা বাচ্চাকে রেখে। একটা শকুন তাদের জড়সড় অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে তার শিকার বানিয়ে নেয়। কিন্তু সে ঠোঁটে দুটো জ্যান্ত বাচ্চাকে ঠিক করে ধরে রাখতে পারেনি। তাই এই বিড়াল-ছানাটা পাহাড়ের কাঁটা ঝোপের মধ্যে পড়ে যায়। বিড়ালটা তাকে এ-ও জানিয়েছে যে, সে অর্কর সঙ্গে তার বাড়িতে যেতে চায়। এ বার কী করবে সে? ঋকরা যদি রাগে অন্ধ হয়ে গিয়ে গাড়ি থেকে ছুড়ে ফেলে দেয় বাচ্চাটাকে? আহা রে! বেচারা। অন্য কোনও গাড়ির তলায় পড়েই পিষে মরে যাবে। বাসের ভিতরে এত ক্ষণ হালকা নীল আলো জ্বলছিল। গোলমালের কারণে স্যরেদের নির্দেশে বড় আলো জ্বালা হল। টিউব লাইটের আলোয় এ বারে সবটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অর্ক বিড়ালছানাটাকে আরও শক্ত করে চেপে ধরল তার বুকের মধ্যে। তার পাশের ছেলে দু'জন, তার সামনের এবং পিছনের ছেলেরা তার বুকে কী আছে দেখার জন্যে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। স্যরেরা এগিয়ে এলেন তার কাছে। সন্তোষ স্যার উঁচু কণ্ঠে বললেন, "অর্ক, কী আছে তোমার দু'হাতের মধ্যে? ওই ভাবে বুকে কী চেপে রেখেছ? কই দেখি? দেখাও বলছি।"

অর্ক মাথা নিচু করে তাও বসে রইল। কোনও উত্তর দিল না। এ বার প্রশান্ত স্যর তার গলা সপ্তমে তুলে বললেন, "তোমাকে তো ভীষণ বাধ্য বলেই জানতাম এত দিন। এমন অবাধ্যতা তো জাস্ট ভাবতে পারছি না! তোমার জন্যে সব ক'টা বাস দাঁড়িয়ে পড়েছে। রাস্তা জুড়ে জ্যাম হয়ে গেছে। ছেলেরা ভয়ে গুটিয়ে গেছে।"

অর্ক কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই বিড়ালটা মিউ মিউ করে ডেকে উঠল। তার ডাকের অর্থ হল, 'আমি একটা ছোট্ট বাচ্চা গো। আমায় ভয় পেতে যাবে কেন ওরা?'

সন্তোষ স্যর চমকে উঠে বললেন, "ওহ! বিড়াল রয়েছে! আমি ভাবলাম কী না কী! কই, দেখাও দিকি?"

এ বার অর্ক একটু সাহস পেয়ে হাত বাড়িয়ে বিড়ালছানাটাকে স্যরেদের মুখের সামনে ধরল। তার পর অবাক হয়ে দেখল,

বিড়ালটার জুলু জুলু মুখের দিকে তাকাতেই স্যারেদের দৃষ্টি কেমন যেন নরম হয়ে গেল। আশপাশের ছেলেরাও ওর মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন ভড়কে গেল। আশ্চর্য ব্যাপার তো! ওর কি কোনও সম্মোহনী শক্তি আছে নাকি?

ঋক ওদের কাহিল অবস্থা দেখে গলাখাঁকারি দিয়ে বলে উঠল, "স্যর, পশুটা বিড়ালই হোক বা অন্য কিছু, ওকে নিয়ে যাত্রা করা অশুভ। ওর কুচকচে কালো রংটা দেখেছেন স্যর? ওটাকে নিয়ে যাত্রা করলে আমাদের বাস নির্ঘাত কোনও বিপদের মুখে পড়বেই। বলা যায় না, হয়তো উল্টেই গেল।"

প্রশান্ত স্যারের গায়ের রং কুচকচে কালো হওয়ার কারণেই হোক বা অন্য কোনও কারণেই হোক, রাগে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল।

সন্তোষ স্যরও বেশ রেগে গেছেন। বললেন, "স্টপ ইট! স্টপ ইট ঋক! কী বলছ এ সব যা তা? লজ্জা করে না তোমাদের? ছিঃ! খুব লজ্জা করছে এটা ভেবে যে, তুমি আমাদের ছাত্র। নিজের উপরই রাগ হচ্ছে, জানো? আমরা হয়তো তোমাদের সুশিক্ষা দিতে পারছি না।"

অর্ক হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে। ঋকের হয়ে তেড়ে আসা স্যরেরা ঋকের বিরুদ্ধে কথা বলছেন? এত ছেলের সামনে অপমান করছেন ঋককে? এ তো চরম আশ্চর্যের ব্যাপার! ঋকের বাবা প্রত্যেক বছর বেশ মোটা টাকা অনুদান দেন তাদের স্কুলকে। সেই কারণে স্যরেরাও বেশ এড়িয়েই চলেন ঋককে। সেই স্যরেরা আজ এ ভাবে কথা বলছেন?

আজ সারা দিন বিড়ালটা অর্কর সঙ্গেই ছিল। তার গায়ের কালো কোটের কারণে অনেকেরই চোখ এড়িয়ে গেছে বিড়ালটাকে। পাহাড়ের উপর ওঠার পর সে বিড়ালটাকে একটা শাল গাছের নীচে বসিয়ে এসে, সন্তোষ স্যরের কাছ থেকে একটা জলের বোতল আব-

একটা কেকের প্যাকেট নিয়ে এসেছে। তার পর কোলে বসিয়ে বাচ্চাটাকে খাইয়েও দিয়েছে। বিড়ালের বাচ্চাটাও মুখে চুক চুক শব্দ তুলে খেয়ে নিয়েছে অনেকটা খাবার। খাবার খেয়ে সে শরীরে বেশ শক্তি পেয়েছে। তার পরেই বিড়ালটা তার গল্প শুনিয়েছে তাকে। সে-ও অবশ্য কম গল্প শোনায়নি বিড়ালটাকে। তার মা-বাবার গল্প, তার ফ্ল্যাট-বাড়ির গল্প, তার স্কুলের গল্প... সব বলেছে তাকে। বিড়ালটাও চোখ বুজে তার সব গল্প খুব মন দিয়ে শুনেছে। তার মা বিড়ালটাকে দেখলে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। আর যখন শুনবে অর্ক তাকে পরিত্যক্ত জায়গা থেকে তুলে এনে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে, তখন মা দু'হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে নিয়ে নেবে। এ কথা সে নিশ্চিত জানে। দুপুরের কথা ভাবতে ভাবতে বর্তমান পরিস্থিতির কথা এক প্রকার সে ভুলেই গেছিল। তার চমক ভাঙল প্রশান্ত স্যারের কথায়।

প্রশান্ত স্যার তাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, "অর্ক, ওকে কোথায়, কী ভাবে পেলে সব গুছিয়ে বলো দেখি।"

অর্ক শান্ত ভাবে পুরো ঘটনাটা এক নিঃশ্বাসে বলল। সব শুনে সব স্যারই এক বাক্যে তার মানবিকতার প্রশংসা করলেন। সন্তোষ স্যার তো দরাজ গলায় এ-ও বললেন, "আমাদের অর্ক আজ যা করেছে, তা কেবল সত্যিকারের মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব। উই আর প্রাউড অব ইউ অর্ক।"

তার পর তার পাশে বসা ছেলে দুটো বিড়ালছানাটাকে কোলে নিয়ে বেশ করে চটকে দিল। বিড়ালটাও আয়েস করে তাদের আদর খেল। সন্তোষ স্যর তাঁর ফার্স্ট-এড বাক্সটা এনে বিড়ালটার কাটা জায়গা ভেজা তুলো দিয়ে পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিলেন। এ-হাত থেকে ও-হাত, বাসের এ-মাথা থেকে ও-মাথা ঘুরে বেড়াচ্ছে বিড়ালটা। ওর সদগতি করতে পেরে বেশ হালকা লাগছে নিজেকে।

সারা দিনের ক্লান্তিতেই হোক বা অন্য কারণেই হোক, বেশির ভাগ ছেলে সিটের পিছনে মাথা হেলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ অর্ক খেয়াল করল, বিড়ালের বাচ্চাটা তার কোল থেকে নীচে নামার জন্যে ছটফট করছে। ওকে ছেড়ে দিতেই বিড়ালটা এক ছুটে ড্রাইভারের কাছে চলে গেল। অর্ক অবাক হয়ে দেখল, বাচ্চাটা ড্রাইভারের পায়ের উপর সুড়সুড়ি দিচ্ছে। অর্ক তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। তার পরেই দেখা গেল, একটা বিরাট বড় লরি তাদের বাসের খুব কান ঘেঁষে পেরোল। অর্ক বুঝল ড্রাইভারের

ঝিমুনি চলে এসেছিল। আর তাই বিড়ালটা ওকে জাগানোর জন্যেই ছুটে গেছিল। মাই গড! বিড়ালটা যদি আজ তার সঙ্গে বাসে না থাকত, কী হত তা হলে?

নাহ! আর ভাবতে পারছে না অর্ক!

(৫)

অর্কদের বাড়িতে বিড়ালটার থাকার দু'মাস পূর্ণ হয়েছে। দু'মাসে তার আকার-আয়তন যতটা বাড়া উচিত, ততটাই বড়সড় হয়েছে সে। ইতিমধ্যে বিড়ালটার একটা জুতসই নামও দিয়েছে অর্ক। রকি। পাহাড়ের উপর থেকে ওকে পেয়েছিল বলে।

সে দিন তাদের স্কুলবাসকে দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচানোর পর ড্রাইভার সহ প্রায় সকলেই প্রশংসা করেছে রকির। যদিও ঋক তার স্বভাবোচিত ভঙ্গিতে বলেছে, "আমি তো আগেই বলেছিলাম, বিড়াল নিয়ে যাত্রা করা অশুভ। শুধু বিড়ালটার জন্যেই এত বড় বিপদে পড়তে যাচ্ছিলাম আমরা। নইলে..."

প্রশান্ত স্যারের বকা খাওয়ার কারণেই বোধ হয় 'কালো' শব্দটাকে বিড়ালের পাশ থেকে বাদ দিয়েছে। যদিও ঋকের এ সব মন্তব্যে অর্কর কিছুই যায় আসে না। কারণ, ঋকদের মতো খারাপ মানসিকতার মানুষদের নিয়ে ভেবে নষ্ট করার মতো সময় বা ইচ্ছে কোনওটাই নেই তার। আজকাল তো সে আরওই ব্যস্ত। রকির সঙ্গে খেলা করে সময় পেলেই। যে দিন রাতে রকিকে প্রথম তাদের বাড়িতে নিয়ে আসে, তার মা সে দিন থেকেই ভালবেসে ফেলেছে ওকে। মা-মরা ছেলে-মেয়েদের প্রতি মায়ের এমনিতেই নরম মন। অর্ক যখন স্কুলে থাকে বা টিউশন পড়তে যায়, তখন তার মা-ই রকিকে দেখভাল করে। রকিও এক মা হারিয়ে আর-এক মা পেয়ে বেজায় খুশি।

রকিটা যে দিনে দিনে কী বিচ্ছু হয়েছে ভাবা যায় না! স্কুলে সে দিনই ম্যাথ্স অ্যাসেসমেন্ট হয়েছিল। কপিটা মাকে দেখাতেই একটা খুচরো ভুলের জন্য মা যেই অর্কর কানটা মলে দিল, অর্ক স্পষ্ট লক্ষ করল, রকির চোখ দুটো হাসিতে জ্বল জ্বল করছে। তার পর মিউ মিউ করে বলেও দিল, 'ঠিক হয়েছে মা বকেছে। পরীক্ষার সময় আরও কথা বলো বন্ধুদের সঙ্গে! মনোযোগ না দিলে কি আর অঙ্ক করা যায়!'

সে সময় রকির হাসি হাসি মুখ দেখে খুব রাগ হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু পরে ও ভেবে দেখল, সে দিন সত্যিই তার মনোযোগের সমস্যা হয়েছিল। তাদের ক্লাসের একটি ছেলে অবিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে

পড়েছিল। সে কারণেই অমন খুচরো ভুলটা হয়েছিল তার। কিন্তু সেটা তো স্কুলে ঘটেছিল। সে তো বাড়ি এসেও সে-ব্যাপারে কাউকে কিচ্ছুটি বলেনি। তা হলে রকি এ সব কথা জানল কী ভাবে? তার তো এ সব জানার কথা নয়!

রকির খাওয়াদাওয়ার স্বভাবেও কিছু অদ্ভুত ব্যাপার রয়েছে। প্রথম যে দিন অর্ক রকিকে নিয়ে বাড়ি এসেছিল, সে দিন রাতে অর্ক মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাচ্ছিল। মা একটা বাটিতে টেবিলের উপরেই রকির জন্যে ওকেও মাছ-ভাত দিয়েছিল। অর্ক বিড়াল সম্পর্কে যতটা জানে, তাতে বুঝত যে, বিড়ালরা মাছের ভক্ত হয়। কিছু কিছু বিড়াল মাছ চুরি করে খেতেও দ্বিধা বোধ করে না। সেখানে অর্ক অবাক হয়ে দেখল যে, রকি বাটির কাছাকাছি মুখ এনে এক মুহূর্ত গন্ধটা শুঁকল। তার পর মুখটা বেঁকিয়ে নিয়ে টেবিল থেকে নেমে গিয়েই ক্ষান্ত হল না, মাছের গন্ধ থেকে আরও দূরে যেতে অর্কর ঘরে গিয়ে খাটে উঠে চুপ করে বসে রইল।

মা তো পুরো তাজ্জব বনে গেছে! এ আবার কেমন বিড়াল রে বাবা, যে কিনা মাছ শুধু নয়, মাছের গন্ধও অপছন্দ করে! তার পর ফ্রিজ থেকে বের করে দুধ আর বিস্কিট দিতেই সে ভাল ছেলের মতো মুখ করে খেয়ে নিল। রকির কারণে তাদের বাড়িতে আজকাল মাছ রান্নাই কমিয়ে দিতে হয়েছে। কারণ মাছ ভাজার সময়ে যে গন্ধটা বের হয়, সেটা রকির একেবারেই পছন্দ নয়।

আর-একটা ঘটনাও খুব অবাক করেছে অর্ককে। তাদের বাড়িতে খুব একটা ড্রাই ফ্রুটস আনা হয় না। অস্বাভাবিক দামের জন্যেই সম্ভবত। সে দিন মা পায়েস করবে বলেই বাবা কিছু কাজু-কিশমিশ এনেছিল। রান্নাঘরে একটা পেরেকে মা সেটা টাঙিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ অর্ক লক্ষ করল, রকি বারে বারে সেই পেরেকের কাছে যাচ্ছে, প্যাকেটটা পাড়তে চেষ্টা করছে আর বারে বারেই ব্যর্থ হয়ে বেজার মুখ করে ঘরে ফিরে আসছে।

বার কয়েক এমন অদ্ভুত কাণ্ড দেখে অর্কর খুব কৌতূহল হল, ব্যাপারটা কী, তা-ই জানতে। সে তাই প্যাকেটটা নামিয়ে কয়েকটা কাজু আর কিশমিশ একটা প্লেটে দিল রকিকে। তার পর সে অবাক হয়ে দেখল রকি সেগুলো পরম তৃপ্তির সঙ্গে চেটেপুটে খেয়ে প্লেট সাফ করে দিল। তার পর থেকে মা বাবাকে দিয়ে কিছু ড্রাই ফ্রুটস আনিয়েছে। শুধু রকির জন্য।

সে দিন ঘটেছে এক অবাক কাণ্ড। তখন ভোর পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটা

বাজে বড় জোর। অর্কর খাটেই র‍্যাক আর সে দু'জনে এক সঙ্গে ঘুমোয়। রকি রোজই ঠিক সাতটায় ঘুম থেকে ওঠে। সে দিন ভোরবেলায় অর্ক টয়লেটে যাওয়ার সময় আবিষ্কার করল যে, রকি বিছানায় নেই। ঘরের দরজা খুলে ডাইনিং হলে বেরোতেই শুনল, কোথা থেকে যেন একটা কচ কচ করে আওয়াজ আসছে। এ-দিক সে-দিক তাকাতেই সে অবাক হয়ে দেখল, রান্নাঘরের এক পাশে মেঝেয় রাখা লাল আলু একটার পর-একটা পরমানন্দে খেয়ে চলেছে রকি। আজ বাবার ছুটি বলে মা ভেবেছিল, মিষ্টি আলু দিয়ে কী একটা পিঠে বানাবে। গত কাল বাবা যখন এনেছিল, তখনই অর্ক দেখেছিল দশ-বারোটা আলু ছিল। এখন দেখল বাকি রয়েছে মোটে ছ'-সাতটা। আর খেলে যদি পেট খারাপ হয়! তাই টেনে-হিঁচড়ে রকিকে ঘরে নিয়ে চলে এল।

পরে অবশ্য মা জানতে পেরে হেসে লুটোপুটি খেয়েছিল। বিড়াল খায় রাঙা আলু! এমন কথা কে-ই বা কবে শুনেছে? মা আজকাল বাবাকে দিয়ে মাঝে মাঝেই রাঙা আলু আনায় শুধু রকির জন্যে।

রকির আরও একটা স্বভাব আজকাল বড্ড অবাক করে অর্ককে। প্রথমে অবশ্য এই স্বভাবটা সে দেখে থাকলেও খেয়াল করেনি। সে দিন বাবার বেরোনোর সময় পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বেরোতে পারছে না কারণ বাবা তার ওয়ালেটটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। অর্ক আর তার মা দু'জনেই হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোথাও পাচ্ছে না। সাধারণত ড্রেসিং টেবিলের উপরেই থাকে সিদ্ধার্থর ওয়ালেট। অর্ক লক্ষ করল, রকি বেশ কিছু ক্ষণ ধরে কপাল কুঁচকে বোঝার চেষ্টা করছিল, কী ঘটেছে। একটু বাদে সে মেঝেয় গন্ধ শুঁকতে লাগল। তার পর এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে শরীরটা গুটিয়ে ছোট্ট করে নিয়ে সোজা ড্রেসিং টেবিলের পিছনে চলে গেল। সেখান থেকে মুখে করে বাবার ওয়ালেটটা নিয়ে এল। অর্ক দেখে থ হয়ে গেছে। সে শুনেছে কিছু প্রজাতির কুকুর এই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়। কিন্তু সামান্য একটা বিড়ালের এমন ক্ষমতা হয় কী করে? সে ভাবতেই পারছে না। তার পর থেকে তাদের বাড়িতে যা-ই হারিয়েছে, তা খুঁজে দেওয়ার ভার পড়েছে রকির উপর। এবং সে প্রত্যেক বারই সফলতার সঙ্গে কৃতকার্য হয়েছে। সে অর্কর ইরেজ়ারই হোক, অথবা মায়ের চুলের ক্লিপ।

দিন কতক আগে বেশ তাড়াতাড়িই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছিল অর্ক। পরের দিন একটা অনুষ্ঠান থাকায় আগে ছুটি হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরেই রোজকার মতো রকির সঙ্গে খেলায় মেতে উঠেছিল। এমন

সময় জানলা থেকে অর্ক দেখল, একটা লোক তিনটে ছাগলকে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে বাজারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় মাংসের দোকানের জন্যে। তিনটে ছাগলই তারস্বরে চিৎকার করতে করতে যাচ্ছে। অর্ক লক্ষ করল, ছাগলের ডাক শুনেই রকির শরীর কেমন যেন শক্ত হয়ে উঠল। তার পরেই খাড়া কান নিয়ে জানলার পাশে ছুটে চলে গেল। সেখান থেকে ভাল করে দেখে নিল, কারা যাচ্ছে। তার পর দু'-তিন দিন কেটে গেছে। হঠাৎ এক দিন মাঝ রাতে ছাগলের ডাক শুনে ধড়ফড়িয়ে ঘুম থেকে উঠে বসল অর্ক। ছাগল কোথা থেকে এল! তার পর সে কান খাড়া করে শুনে বুঝল, ছাগলের ডাকটা আসছে তার খাটের তলা থেকে। তার খাটের তলায় ছাগল ডাকছে! অদ্ভুত ব্যাপার! তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে খাটের তলায় উঁকি দিয়ে যা দেখল, তাতে তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। রকি মুখটা বিকৃত করে ছাগলের মতো ডাকছে। অন্ধকারে রকির চোখ দুটো জ্বলছে। সে দিন রাতে অজানা আতঙ্কে সে ভাল করে ঘুমোতেই পারেনি। সকালে উঠে অবশ্য স্বাভাবিক রকিকেই তার পাশের বালিশে আবিষ্কার করেছিল অর্ক।

তার কিছু দিন পরে রাতে টিউশন থেকে ফিরে অর্ক শুনতে পেল, তার ঘর থেকে টিয়া পাখির টিঁ টিঁ আওয়াজ ভেসে আসছে। ঘরে ঢুকে দেখল রকি তার দিকে পিছন ফিরে খাটে বসে আছে। মায়ের মুখের দিকে বিস্মিত, হতবাক হয়ে তাকাতেই মা একটু হেসে বলল, "আজ সন্ধেয় টিভিতে আমার সঙ্গে একটা অনুষ্ঠানে টিয়ার ডাক শুনেছিল। তার পর থেকেই দুষ্টুটা টিয়ার মতো ডাকছে।"

বিস্ময়ে-উত্তেজনায় খাটের উপর ধপ করে বসে পড়ল অর্ক। এ কী করে সম্ভব? কিছু কিছু মানুষের এ রকম বিশেষ গুণ থাকে বলে সে শুনেছে। তাদের স্কুলেই এক বার একটা প্রোগ্রামে এক জন হরবোলা এসেছিল। হাততালি দিতে দিতে ওদের হাত ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিড়াল হরবোলা? কেউ কস্মিন কালে শুনেছে এই অদ্ভুত কথা?
বেশ কিছু ক্ষণ গালে হাত দিয়ে ভেবে সে একটা সিদ্ধান্তে এল— নাহ! বিড়াল হরবোলার কথা এই পৃথিবীতে কেউ কখনওই শোনেনি।

(৬)

সন্তোষ স্যর ইংরেজি ক্লাস নিচ্ছেন। শেলির 'স্কাইলার্ক' পড়াচ্ছেন। বলছেন, স্কাইলার্কের গান হল 'আনপ্রিমেডিটেটেড আর্ট'।

আনপ্রিমেডিটেটেড অর্থাৎ স্পনটেনিয়াস। স্পনটেনিয়াস শব্দটা অর্কর মাথার মধ্যে পাক খেতে লাগল। রকির আর্টও তো তা হলে আনপ্রিমেডিটেটেড! ওকে তো কখনওই কোনও ট্রেনিং দেয়নি অর্ক। ও যা করে তা নিজে নিজেই করে। নিজের থেকে যে সব অদ্ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা করছে, তা কি স্পনটেনিয়াস নয়? কিন্তু বড় প্রশ্নটা হল, একটা সামান্য বিড়ালের পক্ষে এ সব অদ্ভুত কাজ করা সম্ভব কী ভাবে! কোন অজানা মন্ত্রবলে সে এ সব করতে পারছে!

সে দিন আর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, যার ঘোর থেকে অর্ক এখনও বেরোতে পারেনি। যে সব দিনে তার টিউশন থাকে না, সে সব বিকেলে সে পাশের মাঠে ফুটবল খেলতে যায়। সেখানে ঘণ্টা খানেক খেলে, ঘরে এসে পড়তে বসে যায়। সে দিনও খেলতে গেছিল। কিন্তু পড়ে গিয়ে ডান হাঁটুতে বেশ অনেকটাই কেটে যায়। যখন সে বাড়ি ফেরে তখনও কাটা জায়গা থেকে টপ টপ করে রক্ত পড়ছে। মা ভাল করে পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিল বেশ করে। রকি পুরো ব্যাপারটাই মন দিয়ে দেখছিল। ওর চোখ দুটো কেমন যেন ছল ছল করছিল। অর্ক লক্ষ করেছে সেটা। রাতে সে যেমন ঘুমোয়, তেমনই ঘুমিয়েছিল। ওমা! সকালে উঠেই দেখে অবাক কাণ্ড! তার হাঁটু একদম পরিষ্কার। কোনও কাটা-ফাটা কিচ্ছুটি নেই। এমনকি ডান হাঁটুতে কোনও কাটা দাগও সে আর খুঁজে পায়নি। রকির সামনেই সে তার বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিল, "কী হল বল তো, রকি? ঘা, ব্যথা এক রাতের মধ্যে কেমন করে উধাও হয়ে গেল বল তো? কাল রাতে কি কোনও ম্যাজিক ঘটল নাকি!"

অর্ক পরিষ্কার লক্ষ করল, তার কথা শুনে রকি একটু মুচকি হাসল।

এর দিন কয়েক পরে এক সকালে তরকারি কাটতে কাটতে হঠাৎ অনন্যার বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলটা কেটে গেল। অনেকটা কেটেছে বলে বেশ কিছুটা রক্তও বেরিয়েছে। সকাল বেলায় অসম্ভব তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে গিয়েই এই বিপত্তি ঘটেছে। মায়ের মুখে 'উহ!' আওয়াজ শুনে অর্কর সঙ্গে এক ছুটে রকিও রান্নাঘরে গিয়েছিল। মায়ের কষ্ট দেখে রকিও যে খুবই কষ্ট পেয়েছে, সেটা ওর ছলছলে দু'চোখ দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। কাটা হাত নিয়ে কাজ করতে মা'র খুবই কষ্ট হবে ভেবে অর্করও খুব কষ্ট হচ্ছিল। মা সোফায় এসে বসতে রকিও তার পাশে এসে চুপটি করে বসল। তার পর তার কোলের মধ্যে ঢুকে মিউ মিউ করতে লাগল। অর্ক পরিষ্কার বুঝতে পারল রকি বলছে, 'মা, তুমি কষ্ট পেয়ো না। তোমার কষ্ট

হলে আমারও ভীষণ কষ্ট হয়।'

অর্ক তার পরই বই গোছাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। স্কুলে বেরোনোর সময় হয়ে এসেছে। তাই এর পর রকির কোনও কার্যকলাপ সে আর লক্ষ করেনি। মা তখন সোফায় মাথা ঠেকিয়ে দু'চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। হঠাৎ মায়ের চিৎকারে সে চমকে উঠে মায়ের দিকে তাকাল।

মা বলছে, "এ কী! আমার হাতের কাটাটা কোথায় গেল? এক্ষুনি যে কতটা হাত কেটে গেল!"

তার হাঁটু কাটার পরে যে সন্দেহটা অর্কর মনে দানা বেঁধেছিল, এ বার সেই সন্দেহেই সিলমোহর পড়ল। তার মানে এই ঘা রকির জন্যই শুকিয়েছে। রকির কোনও আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে। পরে মা'র মুখে সে শুনেছিল যে, মায়ের হাতের কাটা জায়গাটা রকি জিভ দিয়ে চেটেছিল। আর তার পরেই সেই অত্যাশ্চর্য ঘটনাটা ঘটেছিল।

রকিকে নিয়ে যখন সে এ সব কথা ভাবছে, তখনই ঢং ঢং শব্দে তার চমক ভাঙল। সন্তোষ স্যারের ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। স্যার বেরিয়ে যাচ্ছেন ক্লাস থেকে। বেল বেজে উঠতে ছেলের দল হই হই করে উঠল। দীপ্তেশ ফার্স্ট বেঞ্চ থেকে পিছন ঘুরে থার্ড বেঞ্চে থাকা আনন্দকে বলল, "এই আনন্দ, ঋকের বাড়িতে কখন যাচ্ছিস? সন্ধের আগেই আমি যাব কিন্তু। তুই আমার সঙ্গে গেলে জানাস। তা হলে এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।"

ওর কথা শেষ না-হতেই উজান বলে উঠল, "আমাদের ঋকবাবু এ বার কী রিটার্ন গিফট দেবে, সেই বিষয়ে শুনেছিস নাকি কেউ কিছু? আমি কিন্তু খুব এক্সাইটেড।"
সকলেই মাথা নেড়ে না জানাল। আনন্দ-কৌতুক মেখে বলল, "প্রত্যেক বারের মতো নিশ্চয়ই সামথিং স্পেশাল!"

সবাই সমস্বরে সম্মতি জানাল। ওদের কথা শুনে অর্কর মনে পড়ল এই রবি বার ঋকের জন্মদিন। প্রত্যেক বছরই বিরাট বড় পার্টি থ্রো করে ঋক। সোনারগাঁও সে দিন সোনালি আলোয় ঢেকে যায়। ঋকদের বাড়ি থেকে অনেক দূর পর্যন্ত রাস্তায় আলোর রোশনাই দেখতে পাওয়া যায়। কত ধরনের খাওয়াদাওয়া, পানীয়ের আয়োজন যে থাকে... তা অর্ক বহু বার গোনার পরেও ভুলে যায়। তার সঙ্গে থাকে নানা স্বাদের ম্যাজিক শো। আর একেবারে সব শেষে যে চমকটা থাকে সেটা হল রিটার্ন গিফ্‌ট। অন্য অনেকেই ঋকের জন্মদিনের অনুষ্ঠানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পানীয় কিংবা খাওয়াদাওয়ার

আয়োজন করে ঠিকই। কিন্তু ঋকের জন্মদিনের কাছে তারা ডাহা ফেল করে যায় শেষের পর্বটুকুতেই। ঋকের সব বন্ধুর জন্যেই ঋক এমন কিছু স্পেশ্যাল জিনিস রিটার্ন গিফ্‌ট হিসাবে রাখে, যা তারা আগে দেখেনি কিংবা ব্যবহার করেনি।

এই তো গত বারেই একটা করে জাপানি পেন দিয়েছিল সবাইকে। সেই পেনের কালি কোনও দিনই নাকি শেষ হয় না। বিদেশি বন্ধুবান্ধব অনেক থাকার কারণে এ সব জিনিস ঋকের বাবা খুব সহজেই বিদেশ থেকে আনাতে পারেন। বন্ধুদের মুখেই অর্ক শুনেছে, বিদেশে নানা ধরনের জিনিস আমদানি-রফতানির কাজ করেন ঋকের বাবা পরমজিৎ উপাধ্যায়। তাই বলাই বাহুল্য, এ বারের জন্মদিনেও তেমনই বিশেষ কিছু রিটার্ন গিফ্‌টের ব্যবস্থা রাখবে ঋক।

অর্কর একটা মন মাঝেমধ্যেই বিদ্রোহ করে জানায়, তারও এমন একটা জন্মদিন হোক। বেশি না হোক, অন্তত একটা। একটা বারের জন্যে তার জন্মদিনের রিটার্ন গিফ্‌ট পেয়ে সবাই চমকে যাক। কিন্তু তার পর তাদের বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থার কথা মনে পড়তেই তার মনটা ভেজা তুলোর মতো চুপসে যায়। ঋকের প্রত্যেকটা জন্মদিনেই সে দেখিয়ে দেয় যে, সে কত আলাদা তার থেকে। কত তার অর্থ। কত তার প্রতিপত্তি। কত লোক, কত লস্কর। কত আয়োজন। অন্য দিকে তার জন্মদিন? কত সাদামাটা। কত ঘরোয়া। কত সামান্য। তার গত জন্মদিনে ঋক তো ফলাও করে শুনিয়েই দিয়েছে, মাসের যে-কোনও দিনই এর চাইতে ঢের বেশি ভাল-মন্দ খাবার রান্না হয় তাদের বাড়িতে।

ভাগ্যিস সে সময় বাবা অথবা মা কেউ ঘরে ছিলেন না। ওঁরা শুনতে পেলে কতই না কষ্ট পেতেন!

আগামী মাসেই তার জন্মদিন। প্রতি মাসের সংসার খরচ থেকে দু'-একশো টাকা করে মা সরিয়ে রাখে তার জন্মদিনের জন্যে, অর্ক জানে। এ বারও নিশ্চয়ই মা কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছে সেই দিনটার জন্যে। কত টাকা জমিয়েছে? তা দিয়ে কি বিরিয়ানি বানানো যাবে? বেশি কিছু না হোক, বিরিয়ানি আর চিকেন চাঁপ হলেই চলবে। তাতেই সে খুব খুশি হবে। ঋকদের মতো বড় রেস্তরাঁ থেকে খাবার আসবে না তাদের বাড়িতে। তার অবশ্য কোনও দরকারও পড়বে না। কারণ, তার মায়ের হাতের বিরিয়ানি অন্য যে কোনও রেস্তরাঁকেই হার মানিয়ে দেবে। তবে এটাও সে ভাল মতোই জানে যে, মায়ের হাতের রান্নার যত ভালই স্বাদ হোক না কেন, সবাই

যতই প্রশংসা করুক না কেন, ঋক কিন্তু সে কথা স্বীকার করবে না কোনও মতেই। উল্টে সে সেটাকে এমন ভাবে বলবে যে, শুনলে নিজের মনেই কেমন যেন খারাপ লাগা তৈরি হবে। চিনচিনে ব্যথা হবে বুকের মধ্যে। আসলে এই ঋকের মতো খারাপ মানুষদের জন্যেই সুন্দর পৃথিবীটাও মাঝে মাঝেই কেমন যেন কুৎসিত, অসুন্দর মনে হয়। আর টাকা নামের কী এক আশ্চর্য জিনিসের জাদুতে এই সব মানুষই সারা পৃথিবীর মধ্যমণি হয়ে ওঠে।

প্রশান্ত স্যর ক্লাসে এসেছেন। ভূগোল পড়াচ্ছেন। বায়ুর উষ্ণতার সঙ্গে বায়ুচাপের সম্পর্ক বোঝাচ্ছেন। সম্পর্কটা ব্যস্তানুপাতিক। উষ্ণতার পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুচাপের পরিবর্তন ঘটে। 'পরিবর্তন' শব্দটা অর্কর মাথার মধ্যে ধাক্কা দিচ্ছে সমানে। তার জন্মদিনে এ বার একটু পরিবর্তন আনলে কেমন হয়? খাওয়াদাওয়ায় পরিবর্তন আনতে না-পারুক, রিটার্ন গিফ্‌টের ক্ষেত্রে যদি একটা পরিবর্তন আনা যায় তা হলে কেমন হয়? প্রত্যেক বছরই তো সে রিটার্ন গিফ্‌ট হিসেবে কুড়ি-তিরিশ টাকা দামের চকোলেট উপহার দেয় বন্ধুদের। সবাই সেটা হাতে নিয়ে বিশ্রী মুখভঙ্গি করে বুঝিয়ে দেয় যে, এ সব জিনিস তারা খেতে অভ্যস্ত নয়। এ বার যদি চকলেটের বদলে অন্য কিছু দেওয়া যায়? না, সবাইকে খাতা-বই-পেন-পেনসিল-খেলনার মতো কিছু কিনে দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই, এটা সত্যি।

কিন্তু এমন কিছু যদি সে দেয়, যা তাদের পেট না ভরালেও, মন ভরিয়ে দেবে কানায় কানায়? এমন জিনিস, যা সে হাতে করে দিতেও পারবে না বা তারা বাড়ি নিয়ে যেতেও পারবে না। কিন্তু সে জিনিস চোখের সামনে দেখে কিংবা কানে শুনে যে রোমাঞ্চ, যে শিহরন অনুভব করবে, তা তারা মনে রাখবে বহু বছর। কেমন হবে তা হলে? নিজের মনেই রোমাঞ্চ অনুভব করল অর্ক।

(৭)

আজ সরস্বতী পুজো। এই দিনটায় অর্ক বিশেষ ভাবে ব্যস্ত থাকে। তার পিছনে একটা বড় কারণ হল এই যে, মা সরস্বতী তার প্রিয় আরাধ্য দেবী। বই-খাতাকে সে মা সরস্বতীর আর-এক রূপ বলেই মনে করে। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে সব মানুষ বইকে ভালবাসে না, সম্মান করে না, মা সরস্বতী কখনওই তাঁদের কাছে থাকেন না। তাই সে শুদ্ধ মনে পুজো এবং প্রার্থনা দ্বারা মা সরস্বতীকে শ্রদ্ধা জানাতে দ্বিধা করে না। এই দিন সে খুব ভোর থাকতেই উঠে পড়ে। তার পর হলুদ দিয়ে স্নান করে পুজোর কাজে মায়ের হাতে হাতে সাহায্য

করে। আলপনা দেওয়া থেকে শুরু করে ফল কাটা পর্যন্ত সব কাজেই সে মায়ের পাশে পাশে থাকে সব সময়। সবটা সে খুব সুন্দর ভাবেই সম্পন্ন করে। আসলে সব কাজই অর্ক খুব মন দিয়ে করে। তাই সুন্দর এবং গোছানো হয়। আজ সকালেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। তবে এ বার রকিও তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে। সে খুব মনোযোগ সহকারে তার কাজ করা দেখেছে। খুব সকালেই স্নান সেরে পুজোর কাজ প্রায় মিটেছে, ঠিক তখনই পুরোহিতমশাই এলেন।

সোনারগাঁওয়ের বেশির ভাগ ব্রাহ্মণই হয় চাকরি-বাকরি করতে অথবা কোম্পানিতে কাজ করতেই অভ্যস্ত। তাদের মধ্যে দু'-চার জন অবশ্য পুরোহিতের কাজ করেন। কিন্তু ক্রমশই ঘিঞ্জি হয়ে ওঠা ফ্ল্যাট-বাড়ির গোলকধাঁধায় বাড়ির পুজোর সময়ে তাদের হাতে পাওয়া আর স্বয়ং ভগবানকে পেয়ে যাওয়া একই কথা। তাই ইদানীং মোবাইলে পুরোহিত ডাকার একটা অ্যাপই ভরসা। সেখান থেকেই পুরোহিত এসেছেন অর্কদের বাড়িতে। দেখতে-শুনতে তিনি বেশ সৌম্যদর্শন। বয়স তিরিশের কোঠায়। যে বিষয়টা অর্কর দারুণ লাগল সেটা হল যে, এর আগে যে সব পুরোহিত তাদের বাড়িতে পুজো করেছেন, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ভুল সংস্কৃত উচ্চারণে পুজো করেছেন। অর্ক তাদের ভুল ধরাতে গিয়ে নিজেই অপ্রস্তুত এবং অপমানিত হয়েছে। কিন্তু এই পুরোহিত পুজো শুরু করতেই অর্কর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এত সুন্দর পুজো সে বহু দিন পর দেখল। অসাধারণ মন্ত্রোচ্চারণে সারা বাড়ি গম গম করে উঠল। অর্কর কোলে বসে রকিও অঞ্জলি সহ পুরো পুজোর সাক্ষী থেকেছে। এত সুন্দর পুজোয় অঞ্জলি দিতে পারলে মনটা বড় পবিত্র লাগে।

পুজোর সময় পরা হলুদ পাঞ্জাবি পরেই মায়ের দেওয়া প্রসাদ খাচ্ছে অর্ক। রকিকেও প্রসাদ দিয়েছে মা। সে খেয়েওছে কিছুটা। বাটিতে কিছুটা অবশিষ্ট রেখেই সে মায়ের ঘরে গিয়ে কেন বসে আছে তা কে জানে! প্রসাদের শেষ অংশটুকু সবে মুখে দেবে অর্ক, ঘটনাটা ঘটল ঠিক সেই সময়েই। হঠাৎ অর্ক শুনতে পেল পুরোহিতের মতো সুর করে কে যেন বলছে, 'সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যেকমললোচনে।'

এক বার নয়। দু'-দু'বার একই উচ্চারণ শুনল সে। দ্বিতীয় বার শুনতেই চমকে উঠে দাঁড়াল। কোথা থেকে এল আওয়াজ! কে করল! মা! ঘর থেকে বেরিয়ে ডাইনিং কাম কিচেনে গিয়ে দেখল মা এক মনে খিচুড়ি রান্নার আয়োজন করছে। গত দু'দিন থেকে মা'র

গলায় খুবই ব্যথা। ক'দিন বাদে বাদেই টনসিল বড্ড জ্বালায় বেচারা মাকে। যে মানুষের কথা বলতেই কষ্ট হচ্ছে, সে এমন ভাবে জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণ করবে কী ভাবে?

নাহ! এটা মায়ের পক্ষে একেবারে অসম্ভব! তা হলে? আর আওয়াজটা আরও কিছুটা দূর থেকে এল বলেই মনে হচ্ছে। অর্থাৎ মা'র ঘর থেকে! কিন্তু মায়ের ঘরে তো রকি ছাড়া কেউই নেই এই মুহূর্তে। রকি নামটা মনে পড়তেই একটা শীতল স্রোত তার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে এল। তবে কি রকিই? কিন্তু এটা ভাবাটাও কি বাড়াবাড়ি নয়? এটা কি কোনও অবস্থাতেই সম্ভব? এর আগে কুকুর, ছাগল কিংবা পাখির ডাক ডেকে রকি তাদের সবাইকে চমকে দিয়েছে এটা একেবারে সত্যি, কিন্তু তাই বলে এত দিন এত চেষ্টা করেও মানুষের গলার স্বর নকল করাতে ব্যর্থ হওয়া অর্ক এটা বিশ্বাস করবে না যে, এত বড় একটা মন্ত্র রকির মুখ থেকেই বেরোচ্ছে।

নাহ! এটা সে মানতে পারছে না। কিন্তু সে যে শুনল! সেটা তবে কী? তা হলে কি সে ভুল শুনেছে? এ কি তার একান্তই কানে শোনার ভুল? আসলে সে একটা বিশেষ কারণে রকিকে নিয়ে ক'দিন ধরে একটু দুশ্চিন্তায় রয়েছে। সে কারণেই হয়তো বা তার এই মনের ভুল। মা'র ঘরের সামনে গিয়েও সে আবার তার নিজের ঘরেই ফিরে এল। প্রসাদের প্লেটটা আবারও হাতে তুলে নিল।

আগামী সপ্তাহে তার জন্মদিন। সে যা স্বপ্ন দেখেছে এবং এখনও দেখে চলেছে, তা কি আদৌ সত্যি হবে? রিটার্ন গিফ্‌টে সে কি এমন কোনও পরিবর্তন আনতে পারবে, যা তার বন্ধুরা ভুলতে চেয়েও ভুলতে পারবে না? কিন্তু রকি কি তার কথা রাখবে? সে তো আজ কত দিন ধরে চেষ্টা করছে রকির গলা থেকে মানুষের কথা নকল করাতে। কিন্তু রকি যেন পাত্তাই দিচ্ছে না তাকে। পশু-পাখির আওয়াজও সে অর্কর ইচ্ছেয় করে না। চলতে ফিরতে তার নিজের যখন যেটা করতে ইচ্ছে হয়, সেটাই সে করে। সেই কারণেই চিন্তায় তার গা-হাত-পা ঠান্ডা হওয়ার জোগাড়। রকি যদি অর্কর বন্ধুদের সামনে তার হরবোলার মতো বিশেষ প্রতিভা প্রকাশ করতে না চায়? যদি সে বিরক্ত বোধ করে? কী হবে তা হলে? সে যে ও দিকে ঋকের জন্মদিনের দিনই বড় মুখ করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বলে এসেছে যে, এ বারে সে বিশেষ কিছু দিতে চায় রিটার্ন গিফ্‌ট হিসেবে। ঋক তো কথাটা শুনেই মুখ বেঁকিয়ে বলেছে, "তিরিশের জায়গায় পঞ্চাশের ক্যাডবেরি খাওয়াবি বুঝি? হা হা হা!"

ওর কথা শুনে স্বভাবতই সবাই হেসে লুটিয়ে পড়েছে। হাসবে না-ই বা কেন? যেখানে কিনা এ বারেও ঋক বিদেশি বল উপহার দিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছে! সেই বল দেখতে ক্রিকেট বলের মতো। অবাক করার মতো বিষয় হল যে, সেই বলে পাম্প দিলেই সে ফুটবল হয়ে যায়। চরম বিস্ময়ে সবাই অবাক হয়ে গেছে বলটা হাতে নিয়ে। এর আগে অর্ক ফোল্ডিং ছাতা, দু'-একটা ফোল্ডিং ব্যাগও দেখেছে, যার জ়িপ টানলেই ছোট ব্যাগ চোখের নিমেষে বড় ব্যাগ হয়ে যায়। কিন্তু তা বলে একটা ক্যাম্বিস বলের মধ্যে পুরো একটা ফুটবলকে লুকিয়ে রাখা! এ-ও কি সম্ভব? এ তো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সে! কিন্তু ঋক জানে কী করে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে হয়।

সেই উপহার পাওয়ার পরেই অর্ক বলেছে যে, এ বার সে এমন একটা কিছু দিতে চায় রিটার্ন গিফ্‌ট হিসেবে, যা এর আগে কেউ কখনওই পায়নি। এ কথা শুনে লোকে হাসবে না তো কি কাঁদবে? ওদেরই বা দোষ কী? যে ক'বছর অর্ক ওদের নেমন্তন্ন করেছে, কোনও বারই চকলেটের বেশি অন্য কিছু দিতে পারেনি। ফলে এ বারে অর্ক মুখে যা-ই বলুক না কেন, সেটাকে তারা ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছু ভাববে না, এটাই স্বাভাবিক। আর এই কারণে তার পর থেকেই সে দারুণ ভাবে চিন্তিত হয়ে আছে। রকিকে নিয়ে এই প্ল্যানটা তার মাথায় হঠাৎ করেই আসে। রকির জন্মদিনের দিন দুয়েক আগে। অর্কদের বাড়ির পাশের গলিতে কুকুরদের লড়াই চলছিল সেই বিকেলে। সে তো প্রায়ই লাগে। রকি জানলায় বসে পুরো ঘটনাটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল। অর্ক ভিতরে ভিতরে সত্যিই চাইছিল যে, রকি এ বার কুকুরের মতো ডাকুক। কিন্তু সে নিজে থেকে ডাকছিল না বলে অর্ক বাধ্য হয়েই ওকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিল, "কী রে রকি, ওদের মতো পারবি না ডাকতে?"

রকি কী বুঝেছিল কে জানে। সে জুল জুল করে তার দিকে বার কয়েক তাকিয়ে জানলা থেকে নেমে অর্কর বালিশের উপর আরাম করে টান টান হয়ে শুয়ে পড়েছিল। অর্ক আর কী করে তখন! সে রকির আরামে বুজে ফেলা দুই চোখের দিকে বার কয়েক তাকিয়ে নিজের পড়ায় মন দিয়েছিল। নাহ! সে দিন রকি কুকুরের ডাক কেন, যে সব ডাক আগে ডেকেছে ইতিমধ্যে, সে সবের কোনওটাই ডাকেনি সে রাতে। কিছুটা হতাশ হয়েই শুতে গেছে অর্ক। কিন্তু পরের দিন সকালে তার ঘুম ভাঙল রকির মুখে কুকুরের ডাক শুনে।

আচমকা ঘুম ভেঙে যতটা না বিস্মিত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি আশায় বুক বেঁধেছে সে।

যাক। তা হলে রকি পারবে। নিশ্চয়ই পারবে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে দিনই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে যে, রকির এই বিশেষ গুণ প্রকাশ্যে আনবে তার জন্মদিনের দিনই। আর সেটাই হবে তার তরফ থেকে বিশেষ রিটার্ন গিফ্‌ট। অর্ক একেবারে নিশ্চিত যে, এমন অদ্ভুত আর এমন আশ্চর্য রিটার্ন গিফ্‌ট এ জন্মে কেউ পাওয়া তো দূর স্থান, কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। আরও কিছু সে হয়তো ভাবত। কিন্তু তার ঘোর কাটল বিশেষ এক আওয়াজ শুনে। আবারও সেই মন্ত্রোচ্চারণ শুনতে পাচ্ছে সে। নিজের গায়ে চিমটি কেটেও দেখল অর্ক। না, এ তার মনের ভুল বা শোনার ভুল নয়। এ তার কল্পনাপ্রসূত কোনও স্বপ্নও নয়। মা'র ঘর থেকে পরিষ্কার আওয়াজ আসছে, 'সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যেকমললোচনে।' কী অপূর্ব উচ্চারণ! কী অদ্ভুত স্পষ্ট! সে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না-করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল মা'র ঘরের দিকে। হ্যাঁ, যা ভেবেছে ঠিক তা-ই। রকি দরজার দিকে পিছন ঘুরে বসে এক মনে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে। অর্ক তার উচ্চারণের স্নিগ্ধতায় থর থর করে কেঁপে উঠল।

(৮)

আজ অর্কর জন্মদিন। সকালে উঠেই মা সোনারগাঁও কালী মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছে। এটা ওর মা প্রত্যেক বছরই করে থাকে। এ বারও তার অন্যথা হয়নি। তার পর উপোস করা অবস্থাতেই কেজি দুয়েক দুধে একটু কাজু কিশমিশ ফেলে অর্কর জন্যে পায়েস বানিয়ে, তবে জল স্পর্শ করেছে।

অন্যান্য বার অর্কর মা তার বন্ধুদের জন্যে লুচি-মাংস অথবা ফ্রায়েড রাইস-মাংস করলেও এ বার ছেলের কড়া হুকুম এসেছে, খুব ভাল করে বিরিয়ানি বানাতে হবে। তাই এ বার অর্কর মা একটু দুশ্চিন্তাতেই রয়েছেন। যদিও তিনি বিরিয়ানি বানাতে সিদ্ধহস্ত, তবুও এ সব বড় ঘরের ছেলেদের মুখে সেই বিরিয়ানি আদৌ রুচবে কি না... এ নিয়েই তাঁর ভাবনা। অবশ্য আজ কয়েক দিন ধরে অর্কও কিছু কম দুশ্চিন্তায় নেই। তার চিন্তার কারণ অবশ্য সম্পূর্ণ আলাদা।

সে চিন্তায় আছে এই ভেবে যে, তার পরিকল্পনা মতো রকি তার বিশেষ গুণ প্রকাশ করতে পারবে কি না, সফল ভাবে সবটা উতরাতে পারবে কি না। অর্ক তো চিন্তায় গত রাতে ভাল মতো

ঘুমোতেও পারেনি। গত সন্ধেয় দীপ্তেশ ফোন করেছিল অর্ককে। সে বার বার জানতে চাইছিল, ঠিক কী ধরনের রিটার্ন গিফ্‌ট অর্ক দিতে চাইছে? অর্ক বেশ বুঝেছে, এটা আসলে ঋকেরই বুদ্ধি। তার সামনে যতই হাসাহাসি করুক না কেন, সবার সামনে তাকে যতই কোণঠাসা করুক না কেন, ভিতরে ভিতরে ঋক নিশ্চয়ই বিষয়টা নিয়ে ভেবেছে। কারণ খুবই সহজ। যা কিছুই ঘটে যাক না কেন, এটা ঋক কোনও মতেই মানতে পারবে না যে, অর্ক রিটার্ন গিফ্‌টে তার চেয়ে এগিয়ে থাকবে, তাকে ছাপিয়ে যাবে। তাই বুদ্ধি করে দীপ্তেশকে দিয়ে ফোন করিয়ে আসল ব্যাপারটা জেনে নিতে চাইছে।

কিন্তু অর্ক কিছুই প্রকাশ করল না। কারণ তার মনে হয়েছে সারপ্রাইজ়টা আজ রাতের জন্যে তোলা থাকাই ভাল। তাই সে কিন্তু কিন্তু করে বলল, "না রে, দীপ্তেশ। তেমন কিছুই নয়। এমনকি যেটা দেব ভেবেছিলাম, সেটাও আদৌ দিতে পারব কি না, তারও শিয়োরিটি দিতে পারছি না। জানিসই তো আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা!"

এর পরে আর কথা বলা সাজে না। তাই দীপ্তেশ কিছুটা নিরাশ হয়েই ফোনটা রেখে দিল। তার পর থেকে অর্কর দুশ্চিন্তার মাত্রাটা লাফিয়ে বেশ কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। সব সময় কী হয়, কী হয় ভাব।

যদিও সারা দিন অর্ক মনে মনে চেয়েছে সময়টা এখানেই থেমে যাক। সন্ধে আসতে আরও কয়েক শতক সময় লেগে যাক। কিন্তু তাতে সময়ের ভারী বয়েই গেছে। সময় তো আর কারও দাস নয়। সময় সময়েরই ভারে এক সময় নিঃশব্দে ঝুঁকে পড়ে, শেষ হয়ে যায়। অর্কর জন্মদিনের সন্ধেও তাই এক সময়ে চলেই এল। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে আঁধার নামতে শুরু করেছে। যদিও আলো ঝলমলে সোনারগাঁওয়ে সন্ধের পরেও আলো কমে না কিছু মাত্র। আকাশের গায়ে পোঁচ পোঁচ অন্ধকার যতই বাড়ছে, অর্কর বুকের ভিতরে ধুকপুকুনি ততই বেড়ে যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝেই সে রকিকে বুকের মধ্যে নিয়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলছে, "কী রে, রকি সোনা! আমার মান-সম্মান রাখতে পারবি তো?"

রকি কী বুঝেছে কে জানে! সে শুধু জুলু জুলু চোখে চেয়ে থেকেছে। কিন্তু অর্কর প্রত্যেক বারেই মনে হয়েছে, রকি কেমন যেন একটু মুচকি হাসল।

বন্ধুদের মধ্যে উজানই প্রথম এল। এসেই অর্কর হাতে গিফ্‌ট দিয়ে

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এ-দিক ও-দিক চাইছে। বোধ হয় অর্কর বলা রিটার্ন গিফ্‌ট কোথায় রয়েছে, সেটাই খুঁজতে চেষ্টা করছে। সে যে কেন ঋকের জন্মদিনে এমন একটা অদ্ভুত ঘোষণা করতে গেল, কে জানে! ইস! তার ভাগ্যে যে কী বিষম অপ্রস্তুত অবস্থা নাচছে, তা হয়তো সে সত্যিই বুঝতে পারছে না।

সোনারগাওঁয়ে যে ক'জন বন্ধু থাকে, তারা প্রায় সকলেই আসবে আজ। আর তারা সকলেই ঋকের অনুগত। এই কারণেই অর্ক আরও বেশি রকমের তটস্থ হয়ে রয়েছে। একে একে দীপ্তেশ, আনন্দ, শুভ, শ্রেয়ান, ঈশান সকলেই চলে এল। অর্ক লক্ষ করল, উজানের মতো সকলের চোখই সারা বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। অর্থাৎ সকলেই স্পেশ্যাল রিটার্ন গিফ্‌ট নিয়ে এক্সাইটেড। এক্কেবারে শেষে কেক কাটার ঠিক আগের মুহূর্তে দামি বিদেশি গাড়ি হাঁকিয়ে এল ঋক। তার শরীরের বিদেশি পারফিউমের গন্ধ অর্কদের সাধারণ, সামান্য ঘরকে সুগন্ধে অসামান্য করে তুলছিল।

বড় একটা গিফ্‌ট বক্সের সঙ্গে বেশ কিছু বিদেশি চকলেট নিয়ে এসেছে ঋক। সেগুলো সবাই কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে। কেক কাটার কিছু পরেই অর্কর মা'র হাতে বানানো বিরিয়ানি আর চিকেন চাঁপ সকলের প্লেটে প্লেটে ঘুরতে লাগল। মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, অর্কর মা'র হাতের রান্না খুব ভালই লেগেছে সবার। যদিও ঋকের ভয়ে কেউ সে কথা প্রকাশ করার সাহস দেখাতে পারছে না। এক মাত্র ঋকই মাঝে মাঝেই তার মুখটা বিকৃত করে বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে, এমন অখাদ্য খাবার নেহাতই সে বাধ্য হয়ে খাচ্ছে। নইলে এ সব খাবার তার মুখে মোটেই রোচে না।

খাওয়ার শেষ পাতে চাটনি, পাঁপড়, মিষ্টি আর পায়েস নিয়ে সবাই চামচ দিয়ে নাড়াচাড়া করছে। এমন সময় ঋকই মুখ খুলল, "এই দীপ্তেশ, আমার বার্থ ডে-তে অর্ক তো বেশ ফলাও করে বলে এসেছে, সে নাকি এ বার কী এক অদ্ভুত রিটার্ন গিফ্‌ট রেখেছে আমাদের সকলের জন্যে! সে সব কই? আমাদের খাওয়া তো প্রায় শেষের মুখে।"

ঋকের কথা শেষ হতে না-হতেই সবাই এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল অর্কের উপরে। সবার মুখে একটাই প্রশ্ন, "কী রে অর্ক, কী সব সারপ্রাইজ় দিবি বলেছিলি আমাদের, সেটা এ বার দে। আর কত ক্ষণ অপেক্ষা করব আমরা?"

ঈশান তার মধ্যেই ফুট কাটল, "আজ আমার টিউশনের কত ভাল

ক্লাসটা মিস করলাম শুধু তোর সারপ্রাইজের কথা ভেবে। আর এখন যদি...”

তার কথা পুরোটা শেষ না-হতেই গম্ভীর ভাবে ঋক বলল, “আমার মনে হচ্ছে সবটাই ঢপ। সবটাই ফাঁকা আওয়াজ, তাই না রে অর্ক? হা হা হা! তোদেরও বলিহারি। অর্ক কী সব বলে এল, আর অমনি তোরাও বিশ্বাস করে বসলি যে ও সত্যিই বিশেষ কোনও গিফ্‌ট আমাদের জন্যে সাজিয়ে রেখেছে। ডিসগাস্টিং! এত বছরেও চিনলি না অর্ক পাগলকে! আমি তো সেই প্রথম দিনেই হাতের তালুর মতো চিনে নিয়েছিলাম ওকে। হুঁহ! ওর দৌড় জানতে বাকি আছে নাকি আমার! জাস্ট ওয়ার্থলেস একটা।”

আবারও হাসির রোল উঠেছে সারা ঘর জুড়ে। লজ্জায় মুখটা লাল হয়ে গেছে অর্কর। অসহায় চোখে ঘরের কোণে বসে মিউ মিউ করতে থাকা রকির দিকে এক বার চাইল সে। কিন্তু নাহ! রকি এখন তার ঘুমোনোর আয়োজন করছে। টেবিলের পাশে ছোট কম্বলের মধ্যে ঢুকে একটা বড়সড় হাই তুলল সে। অর্কর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কেমন যেন একটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাইলও। তার মানে আজ তার সব আশাই শেষ। অর্ককে আরও অবাক করে দিয়ে রকি চোখ বুজে শুয়েই পড়ল এ বার। অর্ক ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

ইতিমধ্যে সবারই খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। বাড়ি ফেরার জন্যে তৈরি হচ্ছে সবাই। আর মাঝে মাঝেই অর্ককে খোঁচা দিয়ে চলেছে ঋক আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। সব দোষ তার নিজেরই। আজ যা ঘটছে, এ সবের জন্যে সে নিজেই দায়ী। সে কেন একটা ছোট্ট বিড়ালের উপর তার মান-সম্মানের ভার চাপিয়ে দেবে? কেন তার মনে হয়নি যে, রকির সে দিন ঘুম পেতে পারে, শরীর খারাপ থাকতে পারে? বা সে দিন রকির হরবোলা হতে ইচ্ছে না-ও করতে পারে। সে তো আর অর্কের কাছে মাথা বিক্রি করেনি যে, তার মান-সম্মান বাঁচানোর এক মাত্র দায় ওই ছোট্ট প্রাণীর উপর বর্তাবে। যা হয়েছে বেশ হয়েছে। তার মতো নির্বোধের সঙ্গে এর চাইতে ভাল কিছু ঘটতে পারেও না।

সবাই জুতোর ফিতে বাঁধছে। আর মাঝে মাঝেই ‘সারপ্রাইজ গিফ্‌ট’ কথাটা বলতে বলতে হো হো করে হেসে উঠছে।

দীপ্তেশই প্রথম, “বাই অর্ক। বাই আন্টি,” বলে বেরোতে যাবে অমনি কোথা থেকে যেন একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ ভেসে এল তার কানে। আওয়াজটা এতই তীক্ষ্ণ আর এতই কাছ থেকে আসছে

যে, সকলেই বেশ চমকে উঠল।

এত ক্ষণে অর্কর মুখে হাজার ভোল্টের একটা আলো জ্বলে উঠল যেন। যাক! এ যাত্রায় তার মান ওই ছোট্ট একরত্তি প্রাণীটাই বাঁচিয়ে দেবে বলেই মনে হচ্ছে।

সবাই এ-দিক ও-দিক চাইছে। সবার মুখেই এক অজানা বিস্ময় লেগে রয়েছে। কী ব্যাপার! আওয়াজটা অর্কর ঘর থেকে আসছে বলেই মনে হচ্ছে। অথচ অর্কর ঘরে এক মাত্র পুরুলিয়ায় পাওয়া সেই বিড়ালটা ছাড়া আর কাউকেই দেখেনি এত ক্ষণ! তা হলে?

এই জট কাটাতে ঋকই আবার মাঠে নেমে পড়ল।

"ওহ মাই গড! অর্ক বোধ হয় আবার কোথা থেকে একটা কুকুর ধরে এনেছে! এত ক্ষণ ওটাকে খাটের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল। একই বাড়িতে কুকুর-বিড়াল একই সঙ্গে পুষছে, এটা দেখিয়ে ও বোধ হয় সারপ্রাইজ় দিতে চেয়েছিল আমাদের।"

দীপ্তেশ বলে উঠল, "এই তা হলে তোর রিটার্ন গিফ্‌ট? হা হা হা! সত্যিই মনে থাকবে তোর এই গিফ্‌টের কথা।"

সবাই এই কথায় হইহই করে উঠল। ঠিক সেই সময় যেন কোনও ব্যাপারই নয়, এমন ভঙ্গিতে রকি টিয়ার ডাক দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সবার হাঁ মুখ আর না-পড়া চোখের পাতা দেখে একটু যেন হাসিই পাচ্ছে অর্কর।

(৯)

ফার্স্ট পিরিয়ড শেষ হয়ে গেছে। গত রাতের অভাবনীয় অভিজ্ঞতার পর থেকে অর্ক লক্ষ করছে, কী এক অজ্ঞাত কারণে সবাই কেমন যেন এড়িয়ে যাচ্ছে তাকে। এর-ওর কানে কী যেন ফিস ফিস করছে। সে কাছে এলেই তাদের ফিসফাস থেমে যাচ্ছে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলে, শুনতে পায়নি এমন ভাব দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। মাথা-মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না অর্ক। কী এমন হল যে, ওরা সবাই মিলে এমন অদ্ভুত আচরণ করছে? গত রাতেই ছিল তার জন্মদিন। ওরা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, রকিকে দিয়ে এমন কোনও সারপ্রাইজ় গিফট দিতে পারে সে।

ভাবতে পারবেই বা কী ভাবে? সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে এ কি সত্যিই সম্ভব? একটা সামান্য বিড়াল কিনা হরবোলা? তাও আবার সেই বিড়াল, যাকে পুরুলিয়া থেকে আনার সময় অকারণে কতই না হেনস্থা করেছে ওই ঋক আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। এটা কি সত্যিই

ঋকদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব? কিন্তু এটাই তো ঘটে পৃথিবীতে। এক দিন যাকে মানুষ দু'পায়ে মাড়িয়ে অপমানে, অসম্মানে বিধ্বস্ত করে, সে-ই এক দিন তাদের গর্বের কারণ হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রেও তো তা-ই হয়েছে। তা হলে ওদের এই সাধারণ, সহজ সত্যিটা মেনে নিতে এত সমস্যা হচ্ছে কেন?

গোটা ক্লাস থম থম করছে। ঋকের চোখ-মুখ লাল হয়ে আছে। যেন যে কোনও সময় রাগে ফেটে পড়বে। কোনও ক্লাসে সে একটা কথাও বলেনি। সন্তোষ স্যর ওকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেসও করেছেন যে, কিছু হয়েছে কি না। কিন্তু ঋক কিছু না বলে, এড়িয়ে গেছে। গোটা ক্লাসে উত্তেজনার পারদ চড়ছে ক্রমশই। আঘাতটা যে অর্কর উপরেই আসবে, এটা সে বিলক্ষণ জানে। কিন্তু কী ভাবে, কখন আসবে... এ বিষয়ে সে কিছুই জানে না।

অপেক্ষার অবসান হল টিফিনের ঘণ্টা পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। অন্য দিন এই ঘণ্টাটার দিকে সকলে মুখিয়ে থাকে। ঘণ্টা পড়তে না-পড়তেই সকলে হুড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে যায়। কিন্তু আজ কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সেটা ঘটল না। ঘণ্টা পড়তেও ছেলের দল ক্লাসে বসেই এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। যেন বিশেষ কারও নির্দেশ পেলেই তারা অ্যাকশনে নেমে যাবে। ওই সিনেমায় যেমন হয় আর কী!

মিনিট চার-পাঁচ পরে ঋকের ইশারায় সবাই এসে এক সঙ্গে অর্ককে ঘিরে ধরল। ওর এ বার একটু ভয় ভয় করছে। কী করবে ওরা তাকে? মারবে নাকি? কিন্তু সে করেছে-টা কী? কিছু অন্যায় তো সে করেনি! অবশ্য ঋকের চক্ষুশূল হওয়ার জন্য অথবা বলা ভাল, ঋকের বিচারাধীন বন্দি হওয়ার জন্য কোনও অন্যায়ের প্রয়োজন হয় না। কোনও অন্যায় না-করা সত্ত্বেও তাদের মতো মানুষরা খুব সহজেই অর্কদের মতো সরল সাদাসিধে মানুষদের অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। অর্ক ভয়ে ভয়ে এ-দিক ও-দিক চাইতে লাগল। জিভ দিয়ে দু'বার সে তার ভয়ে শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট দুটো চেটে নিল। তার পর পরিবেশ সহজ করার জন্যেই হঠাৎ হাসতে হাসতে বলে উঠল, "কী রে? সবাই এ ভাবে আমায় ঘিরে ধরলি কেন রে? কিছু খেলবি নাকি?"

নাহ! সবাই আগে যেমন থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে ছিল, এ বারও সেই অবস্থার এতটুকুও পরিবর্তন ঘটল না। আরও কিছু ক্ষণ ও ভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে বোধ হয় ঋকের নির্দেশেই দীপ্তেশ মুখ খুলল,"অর্ক,

তোর সঙ্গে আমাদের কিছু কথা আছে।”

অর্ক যেন এর অপেক্ষাতেই ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে সহাস্য মুখে বলল, “হ্যাঁ। বল না কী বলবি?”

এ বার আনন্দ গলা ঝেড়ে বলল, “তোর ওই বিড়ালটা পুরুলিয়ার সেই বিড়ালটাই, না?”

অর্ক মুখে কিছু না-বলে সোজা আনন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ও আসলে বুঝে নিতে চাইছে, আনন্দ ঠিক কী বলতে চাইছে।

ঈশান সেই সময়ে বলল, “কেন? তোর কি সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ আছে নাকি? আমি তো গত কাল দেখেই চিনতে পেরেছি ওকে। সেই কুচকুচে কালো রং। সেই জ্বলজ্বলে দুই চোখ! ওই বিড়ালটাই অর্ক পুরুলিয়া থেকে নিয়ে এসেছিল। আমি ঠিক বলছি তো অর্ক?”

এ বার উজান বলল, “কী ভাবে ট্রেনিং দিয়েছিস অর্ক? মানে প্রসেসটা বল তো আমাদের। একটা বিড়ালকে দিয়ে হরবোলা করানো মানে চাট্টিখানি বিষয় নয়। এর পিছনে নিশ্চয়ই অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে তোকে? তাই না অর্ক? সেই ট্রেনিংটা সম্পর্কে আমরা জানতে চাইছি অর্ক। ক্যান ইউ হিয়ার মি?”

এ বার বেশ অবাকই হল অর্ক। কিসের ট্রেনিংয়ের কথা বলছে ওরা? ওহ মাই গড! তার মানে ওরা ভাবছে, সে-ই ট্রেনিং দিয়ে রকিকে হরবোলা বানিয়েছে! সে মিন মিন করে বলল, “ট্রেনিং? কিসের ট্রেনিং?”

“স্টপ ইট! জাস্ট স্টপ ইট! ন্যাকামো করিস না অর্ক। তোর এই ন্যাকামোটা আমি আর নিতে পারি না। আমরা সবাই কি ঘাস খাই নাকি যে, সাধারণ বিষয়টা তুই চেপে গেলেই আমরা সবাই তোকে বিশ্বাস করে ফেলব? বুদ্ধু পেয়েছিস আমাদের? একটা সাধারণ বিড়াল এমনি এমনি এত সুন্দর হরবোলা করতে শিখে গেল? হ্যাঁ?” দীপ্তেশ চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলল।

“কী ভাবে ট্রেনিং দিয়েছিস, বল না রে অর্ক। আমি কাল রাতেই আমার মাকে কনভিন্স করে নিয়েছি। মা আমাকে বিড়াল কেনার অনুমতিও দিয়ে দিয়েছে। ট্রেনিং তুই দিয়েছিস? নাকি কোনও বিশেষ স্কিলড ট্রেনার?” উজান ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল।

অর্ক এ বারও চুপ করেই রইল। এখন এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে সে রয়েছে যে, সে যা-ই বলুক না কেন, সেটাকে ওরা মিথ্যে বলেই

মনে করবে। সেটাকে ওরা অবিশ্বাসের চোখেই দেখবে। তাই সে মৌনতাকেই সঙ্গী করে নিল।

দীপ্তেশের গলা এ বার আরও চড়েছে, "কী রে, কী ভাবছিস তুই? চুপ করে থাকলেই তোর সাত খুন মাফ হয়ে যাবে? হবে না। হবে না। কিছুতেই হবে না। বলতে তোকে হবেই। আজ আর কোনও ছাড়াছাড়ি নেই। খুব চালাক তুই, তাই না? তলে তলে একটা এঁদো বিড়ালকে শিখিয়ে-পড়িয়ে মিরাক্‌ল ঘটিয়ে ফেলে এখন বোকা সেজে আছিস! এত দিন হয়ে গেছে। অথচ আমরা এই বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও কেউ কিছুই জানতে পারিনি!"

উজান দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে বলল, "একে তোরা পাগল বলতিস না? আমি কিন্তু ওর চোখ-মুখ দেখে প্রথম থেকেই বুঝতে পারতাম যে, ও একটা আস্ত সেয়ানা। সব জানে। সব বোঝে। শুধু লোকের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে ভাঁওতাবাজি করে বেড়ায়। আস্ত বদমাশ একটা।"

অর্ক লক্ষ করল, এত ক্ষণ ধরে সবাই কথা বলছে, তাকে শাসানি দিচ্ছে, কিন্তু আসল লোকই মুখে কুলুপ এঁটে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঋকের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল ভিতরে-ভিতরে ঋক ফুলছে, ফাঁপছে। যে কোনও সময় সে সুনামি হয়ে আছড়ে পড়বে, তার উপর। তখন যে সে নিজেকে কী ভাবে বাঁচাবে, তা সে মোটেই বুঝতে পারছে না। এখন কী করা উচিত তার? বাইরে পালিয়ে যাবে? চিৎকার করে স্যরদের ডাকবে? কিন্তু এই দুটো কাজের মধ্যে যে একটাও লাভজনক হবে না, তা সে বেশ বুঝতে পারল। এত ছেলের দঙ্গলের মধ্য থেকে বেরোনো মোটেই সহজ বিষয় নয়। আর চিৎকার? এই লাঞ্চ ব্রেকের সময় গোটা স্কুলই হাঁ হাঁ করে চেঁচাচ্ছে। সেখানে সে যতই চেঁচিয়ে মরুক না কেন, কেউ তার ডাক শুনতেই পাবে না।

অর্ক যখন এ সব কথাই ভাবছে, ঠিক তখনই ঋকের আওয়াজ ঝন ঝন করে বেজে উঠল। সে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, "দীপ্তেশ, তোরা এ সব ফালতু কথা বন্ধ কর প্লিজ়। ওর বাড়িতে তোদের বিড়াল নিয়ে গিয়ে বরং শিখে আয়, কী ভাবে একটা পাতি বিড়ালকে হরবোলা করে তোলা যায়।"

সবাই এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগল। কী বলতে চাইছে ঋক?

উত্তরটা ঋকই দিল। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "অর্ক, তোর ওই বিড়ালটা আমার চাই। আমার চাই। আমার চাই। ডু ইউ

আন্ডারস্ট্যান্ড অর্ক? চাই মানে চাই। জানিসই তো, যে জিনিস আমার পছন্দ, তা আমার হাতে আসবেই আসবে। তাই দিতে তোকে হবেই। এই বিষয়টা নিশ্চিত। এ বার কথা হচ্ছে, কী ভাবে দিবি। দুটো অপশন আছে তোর কাছে। এক, তুই আমার বাড়ি এসে বিড়ালটা স্বেচ্ছায় দিয়ে যাবি। এই উপায়টা দু'জনের জন্যেই সম্মানজনক। এর জন্য আজকের দিনটাই তোকে সময় দিলাম। আজকের মধ্যে তুই আমার বাড়ি এসে ওটাকে আমার হাতে দিয়ে যাবি। আর দ্বিতীয় উপায় হল, আমি তোর বাড়ি থেকে বিড়ালটা তুলে নিয়ে আসব। আজকের দিনটা তোর জন্যে অপেক্ষা করব। কিন্তু আগামী কাল এই পৃথিবীর কেউ আর আমায় আটকে রাখতে পারবে না। এ বার তোর সিদ্ধান্ত। তুই ঠিক কর কোন উপায়টা তুই বেছে নিবি। হা হা হা!”

নিষ্ঠুর, অসহ্য একটা হাসি ঋকের দাঁত, চোয়াল ভেদ করে অর্কর গায়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এ সব কী শুনছে সে? ঋক কী বলছে এ সব?

(১০)

বাড়ি ফিরেও থর থর করে কাঁপছে অর্ক। ঋকের কথা মনে পড়লেই গা-হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তার। বিকেলের টিউশনে সে আজ যেতে পারেনি। মাথা যন্ত্রণা করছে বলে সারাটা বিকেল-সন্ধে সে ঘরে শুয়েই কাটিয়ে দিয়েছে। মা অনেক বার মাথা টিপে দিতে চেয়েছে। কিন্তু তাতেও রাজি হয়নি। নানা অজুহাতে মাকে ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে। আসলে মা বেশি ক্ষণ তার কাছে থাকলেই সে মায়ের চোখে ধরা পড়ে যাবে। মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড়ই কঠিন কাজ। মা শুনতে পেলেও চিন্তায় পড়ে যাবে। এমনিতেই মায়ের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা আছে। তাই যত ক্ষণ পারবে, সে মা'র কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটাই লুকিয়ে রাখবে। কিন্তু কাল? কাল কি করে মায়ের কাছ থেকে লুকোবে?

অর্ক স্কুল থেকে ফেরার পর থেকে সব সময়ই রকি কিন্তু তার বুকের সঙ্গে লেপ্টে আছে। অন্য দিন রকি তাও এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়ায়। কিন্তু আজ সে কী বুঝেছে, কে জানে! অর্ককে এক মুহূর্তের জন্যেও সে কাছ-ছাড়া হতে দিচ্ছে না। সন্ধের আগে অর্কর অসহায় দুটো চোখ রকিকে জড়িয়ে বার বার জলে ভিজে যাচ্ছিল। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল তার। পুরো ঘটনার জন্যে সে-ই এক মাত্র দায়ী। তার কোনও দরকার ছিল না ঋকদের সারপ্রাইজ় দেওয়ার। ঋক যে কেমন ধরনের ছেলে, সে কি তা জানত না? জানত তো।

খুব ভাল মতোই জানত।

সোনারগাঁওয়ের যে-কোনও অমূল্য জিনিস ঋকের কাছে থাকবে, এটাই অলিখিত নিয়ম। ছলে-বলে-কৌশলে সেই জিনিস সে নিজের দখলে আনবেই আনবে। কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু এত দিন পর্যন্ত বিষয়টা জিনিসপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেটা হয়তো রকির মতো কোনও বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাণী তার চোখে পড়েনি বলেই। নইলে হয়তো এর আগেই এই বিষয়ে তার হাতেখড়ি হয়ে যেত।

সোনারগাঁওয়ের কোনও ছেলে হয়তো ঋকের চেয়েও বেশি ভাল একটা মাউথ অর্গ্যান পেয়েছে কোথা থেকে। খবরটা ঋকের কানে শুধু যাওয়ার অপেক্ষা। তার পর সে জিনিস যে কোনও মূল্যে অনায়াসেই চলে আসবে তার জিম্মায়। এ রকম আরও কত খবর সোনারগাঁওয়ের আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়ায়!

অর্ক তো এ সব কথা প্রথম থেকেই জানত। তার পরেও সে কী করে এত বড় ঝুঁকি নিল! কী করে পারল ছোট্ট রকির জীবনটাকে এ ভাবে বিপদসঙ্কুল করে তুলতে? এতটুকু দায়িত্ববোধ কি ছিল না তার? নিজের কপালে নিজেই চাপড় মারছে বার বার। নিজের উপর রাগে নিজের মাথার চুল টানছে অর্ক। তাতে যদি তার দোষ খণ্ডন করা যায়।
আজ হিসেব মতো ঋকের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে নিজের হাতে রকিকে তার কাছে তুলে আসার কথা। অন্তত ঋক সে রকমই বলে দিয়েছে। নিজের হাতে তার সবচেয়ে প্রিয় জনকে ঋকের মতো কারও হাতে তুলে দেওয়ার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তাতেই বা কত ক্ষণ সে রকিকে নিজের কাছে রাখতে পারবে? কাল সকালে বা বিকেলের মধ্যে ঋক নিজেই তার বাড়িতে এসে হাজির হবে। তার পরে টানতে টানতে রকির তীব্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে নিজের কাছে নিয়ে যাব। কাল থেকে তার প্রিয়তম রকি এই জীবনের জন্যে চলে যাবে ঋকের কাছে। আর কোনও দিন সে হয়তো রকিকে আর চোখের দেখাও দেখতে পাবে না। তাও সে সবটা সহ্য করে নিতে পারত। যত কষ্টই হোক, রকিকেও ছেড়ে সে থাকতে পারত, যদি সে শুধু এইটুকুনি জানত যে, ঋকের কাছে রকি ভাল থাকবে। কিন্তু সে গুড়েও বালি।

ঋক যে ধরনের নির্মম মানুষ, তা থেকেই বোঝা যায়, শুধু রকি কেন, পৃথিবীর কাউকেই ভাল রাখার ক্ষমতা ওর নেই। রকিকে ভাল

রাখার জন্যে, ভালবাসার জন্যে সে রকিকে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছে না। সে নিয়ে যাবে কারণ এমন অদ্ভুত, এমন গুণী বিড়াল এই সোনারগাঁওয়ে সে ছাড়া আর অন্য কারও কাছেই থাকতে পারবে না, তাই। এর পর সে হয়তো রকিকে কোনও জাদুঘরে দিয়ে দেবে। অথবা বিদেশে পাঠিয়ে দেবে। ওর বাবার বিদেশে আমদানি-রফতানির বড় ব্যবসা রয়েছে। দেশের কত পুরনো দামি জিনিস, পুরনো গয়না, দামি পাথর, মূর্তি কত কিছু যে বিদেশে পাচার করে দেয়, তার ইয়ত্তা নেই। সে রকমই হয়তো রকিকেও... নাহ! সে আর ভাবতেই পারছে না।

বুকের মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণা উথাল-পাথাল করে দিচ্ছে তাকে। কাঁদতে কাঁদতে সে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের মধ্যেই সে দেখল কত সব হিজিবিজি স্বপ্ন। সে সব স্বপ্ন কী ভয়ানক! কী অদ্ভুত! স্বপ্নের মধ্যে সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, ঋক রকিকে কেড়ে নেওয়ার জন্য তার পিছনে মরিয়া হয়ে ছুটছে। ঋকের আগে আগে রকিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে ছুটছে অর্ক। ছুটতে ছুটতেই দেখতে পেল একটা পাহাড়ের কাছে এসে পড়েছে সে। পাহাড়টা দেখে ও সে দিকেই এগিয়ে যেতে লাগল। পাহাড়টায় যতই উঠছে, ততই তার কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছে। কোথায় যেন দেখেছে জায়গাটা এর আগে। কোথায় দেখেছে? কোথায় দেখেছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। এ বার মনে পড়েছে। জায়গাটা পুরুলিয়া। আর যে পাহাড়টায় সে উঠছে, সেটা অযোধ্যা পাহাড়। অর্ধেকটা ওঠার পর একটা বড় পাথর থেকে তার পা হড়কে গেল। একটা কাঁটাঝোপের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। এই কাঁটাঝোপটাও তার বড় চেনা। এখান থেকেই তো সে রকিকে পেয়েছিল, তাই না?

কাঁটায় তার গা-হাত-পা কেটে রক্ত ঝরছে। সে আর কোনও মতেই সেই ঝোপ থেকে উঠতে পারছে না। ও দিকে ঋক তার সাঙ্গোপাঙ্গ

নিয়ে তত ক্ষণে পৌঁছে গেছে তার কাছে। সকলেই ওকে দেখে হাসছে। ঋকের সঙ্গে থাকা গুন্ডারা তার কোল থেকে রকিকে সবলে কেড়ে নিচ্ছে। ঋক এ বার ফিরে যাচ্ছে। যাওয়ার আগে তার চোখে মুখে কেমন যেন একটা চাহনি!

হঠাৎ তার ঘুমটা ভেঙে গেল। এমন ভয়াবহ স্বপ্ন দেখেই সম্ভবত সে দর দর করে ঘামছে। ঘামেই তার মুখ ভিজে সপ সপ করছে। হাত বাড়িয়ে পাশের টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে দেখল, এখন রাত তিনটে বাজে। তার বুকের পাশে পরম নিশ্চিন্তে ছোট্ট রকি ঘুমিয়ে রয়েছে। আগামী কাল থেকে এমন নিশ্চিন্তে কি বেচারা আর ঘুমোতে পারবে?
ওয়াশ রুমে যাওয়ার সময় সে দেখল, সামান্য শব্দেই রকির ঘুমটা ভেঙে গেছে। ফিরতে ফিরতে শুনতে পেল যে, রকি মিউ মিউ করছে। জলের শব্দে সে এত ক্ষণ রকির আওয়াজ ভাল মতো শুনতে পাচ্ছিল না। এ বার সে ওয়াশ রুম থেকে বেরোতেই স্পষ্ট শুনতে পেল, রকি মিউ মিউ করে বলে চলেছে, 'তোমার বন্ধু আমার কিচ্ছুটি করতে পারবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারো। অত চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘুমোচ্ছ বলেই অমন ভুলভাল স্বপ্ন দেখে ভয় পাচ্ছ। আমি আমার অর্কদাদার কাছেই সারা জীবন থাকব। ঋক কেন, স্বয়ং যমদূতও তোমার কাছ থেকে আমায় আলাদা করতে পারবে না।'

অর্ক চরম বিস্ময়ে রকিকে দেখছে। এ যেন সেই ছোট্ট বিড়ালটা নয়। এ যেন বড় কোনও মানুষ। এ যেন কোনও প্রাচীন, বৃদ্ধ ভবিষ্যৎ-বক্তা। যে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ চোখ বন্ধ করে নির্ভুল ভাবে বলে দিতে পারে।

সে কি বিশ্বাস করবে রকির কথা? তার কি এ বার একটু নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত? কিন্তু ও যদি ভুল বলে? তবে অভিজ্ঞতা থেকে অর্ক জানে যে, এর আগে যত বার রকি যা যা বলেছে, সবটাই অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। তা হলে কি এই কথাও ফলে যাবে? তা-ই যেন হয়। সে তার দু'হাত জোড় করে ঠাকুরের উদ্দেশে বলতে লাগল, "রকির কথা সত্যি করে দাও ঠাকুর। সত্যি করে দাও ঠাকুর।"

(১১)

আজ সারাটা দিনই ছটফট করতে করতে কাটিয়েছে অর্ক। রবিবার বলে স্কুলেও যেতে হয়নি। শেষ রাতের দিকে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে ঘুম থেকে উঠতে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেছে।

তাতে অবশ্য তার ভালই হয়েছে। কারণ এই রকম মুহূর্তে জেগে কাটানোর চাইতে ঘুমিয়ে কাটানো অনেক বেশি সুখদায়ক। সকাল থেকে অর্ক এক মাত্র রকি ছাড়া আর কারও সঙ্গেই বিশেষ একটা কথা বলেনি। কথা বলতে ইচ্ছেই করেনি। চাপা একটা দুশ্চিন্তায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল। দুপুরে মা-ই জোর করে ধরে একটু খাইয়ে দিয়েছে। খাওয়াদাওয়ার পরে রকিকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে বসে বইপত্র নাড়াচাড়া করছিল অর্ক। এমন সময় বাইরে আওয়াজ শুনতে পেয়েই সচকিত হয়ে জানলার সামনে ছুটে এল।

এই লাল দামি গাড়িটা যে কাদের, সেটা সে বিলক্ষণ জানে। জানলা থেকেই দেখল গাড়ি থেকে নামছে ঋক। ও পাশের দরজাও খুলে গেল। ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ঋকের বাবা পরমজিৎ। তার মানে ঋক তৈরি হয়েই এসেছে। মাই গড! সাদা খড়ির মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার মুখ। সে মনে মনে ভেবেছিল, শুধু ঋকই আসবে বোধ হয়। সে ক্ষেত্রে ওকে একা হ্যান্ডেল করাটা অনেক বেশি সহজ ছিল। কিন্তু ওর বাবার মতো ধূর্ত ব্যবসায়ীকে সামলানো তাদের কম্মো নয়। অর্কর শরীরে আবার সেই কাঁপুনিটা ফিরে এল।

কলিং বেল বাজছে। অর্কর মা হঠাৎ ওদের দু'জনকে আসতে দেখে খুব অবাক হয়েছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ না-করে সহাস্য মুখে ওদের আপ্যায়ন করে ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুমের সোফায় বসালেন। কিন্তু ওরা যে কেন এসেছে, উনি সেটা জানেন না। যদি সত্যি জানতেন, তা হলে বোধ হয় এতটা প্রসন্ন হতে পারতেন না।

অর্কর মা ওদের বসিয়ে দিয়ে কিচেনে ঢুকেছেন। কোনও খাবারের ব্যবস্থা করতেই বোধ হয়। কিচেনের টুংটাং শব্দে অর্ক ঘরে বসেই বুঝতে পারল। পরমজিৎ ব্যস্ত মানুষ। স্বভাবতই এত সময় তার হাতে নেই। সে গলা ঝাঁকিয়ে অর্কর বাবা কোথায় আছে, সেই খবর নিল। অর্কর বাবা আজ বাড়ি নেই। অর্কর ছোট পিসির খুব শরীর খারাপ বলে আজই তিনি তাঁর হাওড়ার বাড়িতে গেছেন। অর্ক আজ যেতে নিষেধ করেছিল বাবাকে। কিন্তু ঠিকমতো যুক্তি খাড়া করতে পারেনি বলে তাঁর যাওয়া আটকাতে পারেনি।

অর্ক এক বার ভেবেছিল রকিকে নিয়ে বাবার সঙ্গে পিসির বাড়িতে গিয়ে ক'দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। কিন্তু এই সোমবার থেকে তার স্কুলে অ্যাসেসমেন্ট রয়েছে। তাই তার যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আর তা ছাড়া পালিয়ে গিয়ে বিপদের মুখ থেকে সরে যাওয়া

ধর্ম-বিরুদ্ধ কাজ।

এ ভাবে পলায়নবাদীদের মতো বাঁচাকে সে বেঁচে থাকা বলে মনেই করে না। বিপদকে সামনে থেকে প্রতিরোধ করে জিতে আসাকে, সে মনে মনে সমর্থন করে। এই লড়াইয়ে হেরে গেলেও সম্মান আছে। কিন্তু এ বার তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে রকি নামের ছোট্ট প্রাণীটার ভাল থাকা, মন্দ থাকা কিংবা বেঁচে থাকা। তাই পালিয়ে যাওয়ার কথা তার মাথায় এসেছে।

অর্ক তার ঘরের পর্দার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পর্দা ফাঁক করে সে লক্ষ করছে ঋকদের। ঋক মাথা ঘুরিয়ে এ-দিক ও-দিক দেখছে আর ওর বাবার কানে ফিস ফিস করে কী সব যেন বলে চলেছে। অর্কর মা তার মধ্যেই ওদের জন্য দু' গ্লাস শরবত নিয়ে এসেছে। সেই শরবত অবশ্য টেবিলেই পড়ে রইল। কেউই মুখে দিল না দেখে অর্কর মা কী বুঝলেন কে জানে!

তিনি মুখটা দুঃখ দুঃখ করে বললেন, "ঋকের মাকেও তো সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারতেন দাদা! তা হলে এই সুযোগে ওঁর সঙ্গেও আলাপটা হয়ে যেত। অর্কর প্রাইমারি স্কুলের বন্ধুদের মায়েদের সঙ্গে এখনও আমার বিশেষ বন্ধুত্ব রয়েছে। বাচ্চাদের মায়েদের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলে তার প্রভাব বাচ্চাদের উপরেও পড়ে। আর এটা খুবই দরকার।"

পরমজিৎ কপাল কুঁচকে রয়েছেন অনেক ক্ষণ ধরে। তাঁর চোখ-মুখ বলে দিচ্ছে যে অর্কর মা'র কথাগুলো তাঁর কাছে প্রলাপ ছাড়া আর কিচ্ছু নয়। তিনি এ বার কড়া গলায় ঋকের দিকে চেয়ে বললেন, "খোশগল্প করতে আর শরবত খেতে এসেছিস বুঝি এখানে? তার জন্যে আমার এত সব দরকারি কাজ বাতিল করেছি?"

ঋক সবে শরবতের গ্লাসটা হাতে তুলেছিল। পরমজিতের কথা শুনে সে সশব্দে গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, "আন্টি, অর্ক কোথায়? অর্ক?"

অনন্যা বলে উঠলেন, "অর্কর কাল থেকে শরীরটা খুবই খারাপ। একটু ঘুমিয়েছে। ডাকব?"

"না-ডাকলেও চলবে। শুধু আপনাদের বিড়ালটাকে ডেকে দিন। ওর জন্যেই আমার আসা। নইলে আর শুধু শুধু আপনাদের বাড়িতে আসব কেন আমি?" পরমজিৎ গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন।

"বিড়ালের জন্য? মানে?"

"সে কী! এত সহজ মানেটাও বুঝতে পারছেন না আপনি? আপনাকে তো বেশ সমঝদার বলেই মনে হল!"
"না। মানেটা সত্যিই বুঝতে পারছি না।"

"ঋকের মুখে শুনলাম আপনাদের বিড়ালটা অনেক কিছু জানে। আমার ঋকের ওটাকে খুব মনে ধরেছে। তাই নিতে চলে এলাম। বুঝলেন কি না, ম্যাডাম?"

চরম বিস্ময়ে মায়ের মুখ হাঁ হয়ে গেছে। তিনি যারপরনাই বিস্মিত হয়ে বললেন, "কিন্তু আমরা তো রকিকে বিক্রি করার কথা কাউকে বলিনি!"

"বিক্রি? হা হা হা! তা অবশ্য এক দিক থেকে ঠিকই বলেছেন ম্যাডাম। বিনা মূল্যে আমি কারও কাছ থেকে কিছু নিই না। এই বিষয়ে আমার দুর্নাম আছে বাজারে। বুঝলেন কি না ম্যাডাম?"
"কিন্তু..."

"আরে ম্যাডাম, টাকার কথা শুনে অত লজ্জা পাওয়ার কিচ্ছু নেই। টাকা হল গিয়ে মা লক্ষ্মী। তিনি সবার কাছে থাকেন না। এই যেমন দেখুন না, আপনাদেরও তো
সেটারই অভাব।"

"আন্টি, আপনাদের বিড়ালের মতো কাউকে এত ভাল হরবোলা করতে আমি জীবনে কোথাও শুনিনি। ইন ফ্যাক্ট, আপনাদের বিড়ালটা দেখার আগে আমি এটাও জানতাম না যে বিড়াল কখনও হরবোলা হতে পারে!" ঋক মুখ খুলল।

"নিজের কানেই এ বার শুনলেন তো ম্যাডাম! আমার ঋক মুখ ফুটে যা চায়, তা দিতে কখনওই কার্পণ্য করি না আমি। ও মুখ ফুটে যখন আপনাদের বিড়ালটা নিতে চেয়েছে, তখন সে তো আমাকে দিতেই হবে! তার জন্যে বেশ কিছু টাকা যাবে ঠিকই। কিন্তু তা নিয়ে আর ভেবে কী হবে বলুন!"

বলেই পরমজিৎ দু'হাজার টাকার দুটো নোট টেবিলের উপরে রাখল।

অনন্যা এ বার তাঁর সব সহ্যের সীমা পার করে ফেললেন। রাগে-ঘেন্নায় মুখ কুঁচকে বললেন, "মি. পরমজিৎ উপাধ্যায়, ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন, রকি শুধুই এই বাড়ির পোষ্য নয়। রকি আমার দ্বিতীয় সন্তান। এই ক'টা টাকা কেন, কোটি টাকা দিয়েও মায়ের বুক থেকে সন্তান কেনা যায় না। আর-একটা কথা, মা'র কাছে সন্তান

অমূল্য। তার দাম দেওয়ার চেষ্টা করে নিজেকে আপনি অসম্মান করছেন।”

অর্ক স্পষ্ট দেখতে পেল পরমজিতের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। তিনি রেগে বলে উঠে বললেন, “হাউ ডেয়ার ইউ! ভদ্র ব্যবহার করছি আর সেটাকে ভেবে নিয়েছেন আমার দুর্বলতা?”

হঠাৎ রূপ পাল্টে যাওয়া পরমজিৎকে দেখে অর্কর মা ভয় পেয়ে গেছেন ভীষণ। ভয়ে-উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছেন।

পরমজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঋকের দিকে তাকিয়ে বললেন, “অর্কর ঘরটা কোন দিকে রে ঋক? ওর কাছেই বোধ হয় ওই বিড়ালটা রয়েছে। চল তো দেখি!” বলেই ঋকের সঙ্গে অর্কর ঘরের দিকে এগিয়ে এল দু’জনেই।

অনন্যা এত ক্ষণ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো দাঁড়িয়েছিলেন। এ বার তিনি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললেন, “না। এটা করতে পারেন না আপনি। এটা অন্যায়। রকি আমার সন্তান। ওকে আপনি এ ভাবে নিয়ে যেতে পারেন না।”

পরমজিৎ অবশ্য তাঁর কথায় কোনও পাত্তাই দিলেন না। সবেগে ঋকের হাত ধরে চলে এলেন অর্কর ঘরে। অর্ক রকিকে বুকে চেপে ধরে খাটের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সবটা অর্কর কাছে কেমন যেন দুঃস্বপ্নের মতো লাগছে। বার বার মনে হচ্ছে এক্ষুনি বোধ হয় তার ঘুম ভেঙে যাবে। আর ঘুম থেকে উঠেই দেখবে, এত ক্ষণ ধরে যা ঘটেছে, সে সব আসলে তার কল্পনা কিংবা স্বপ্ন । বাস্তবের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই।

কিন্তু না। এ সব যে তার কল্পনা নয়, বরং রূঢ় বাস্তব, তার প্রমাণ মিলল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। পরমজিতের লোভী হাত স্পর্শ করল রকিকে। অর্ক লক্ষ করছে, ক্রুদ্ধ চোখে রকি এক বার চাইছে ঋকের দিকে। আর এক বার তার বাবার দিকে। এত দিনে রকির চোখে এমন আগুন এক বারের জন্যেও অর্কর নজরে পড়েনি। ও ভাবতেই পারছে না, এই ছোট্ট একরত্তি বিড়ালটা এমন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। দু’-এক মুহূর্ত ওই ভাবে চেয়ে থাকার পরেই ঘটে গেল অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড। অর্ক অবাক, বেসামাল হয়ে চেয়ে আছে সেই দিকে। ছোট্ট বিড়ালটা কী করে যে এমন কাণ্ড ঘটাল, সে এখনও সেটা বুঝতে পারছে না!

রকি তার কোল থেকে এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পরমজিতের মুখের উপর। তাঁর গাল কামড়ে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়ে দিয়েছে সে। অবিশ্বাস্য! অকল্পনীয়! রকি এত দিনে একটা পিঁপড়েকেও মারেনি। কাউকে সামান্য আঁচড়ও দেয়নি। সে কিনা এমন করল! এ কী করে সম্ভব? এ কী ভাবে ঘটতে পারে? রক্তে ভেসে যাচ্ছে পরমজিতের মুখ। ঋকের মুখ ভয়ে-আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে কী করবে বুঝতে না-পেরে পরমজিৎকে টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করছে রকির কাছ থেকে। রকি পরমজিৎকে ছেড়ে রাগে ফোঁস ফোঁস করছে। ঋক ভীত চোখে রকির দিকে চাইতে চাইতে পরমজিতের হাত টেনে বাইরে বেরিয়ে গেল। অর্ক ওদের গাড়ি ছাড়ার আওয়াজ শুনতে পেল ঘর থেকেই।

(১২)

"মি. চৌধুরী, উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর প্রবলেম। আমরা বিষয়টা স্কুল কমিটিকে জানাচ্ছি। কিন্তু অর্ককে সোনারগাঁও মিশনারি স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার কথা ভাববেনও না দয়া করে। অর্ক ইজ় আ পিস অব জেম। ওর মতো এক জন ছাত্রকে ছাড়ার কথা আমরা ভাবতেও পারি না," অর্কর স্কুলের প্রিন্সিপাল মি. নিখিলেশ ত্রিবেদী কথাগুলো অর্কর বাবা সিদ্ধার্থ চৌধুরীকে বললেন।

সিদ্ধার্থ আর অনন্যা দু'জনেই খুব ভীত হয়ে পড়েছেন ঋককে নিয়ে। ওদের ধারণা ঋক, যে-কোনও মুহূর্তে অর্কর কোনও বড় ক্ষতি করে দেবে। তাই ওঁরা ঠিক করেছেন, সোনারগাঁও স্কুল থেকে ছাড়িয়ে অর্ককে অন্য কোনও স্কুলে ভর্তি করে দেবেন।

প্রিন্সিপাল স্যারের কথা শুনে সিদ্ধার্থ একটু চুপ করে থেকে বললেন, "কিন্তু এ ভাবে কাঁহাতক অত্যাচার সহ্য করা যায়? না স্কুলে ছেলেটা তিষ্ঠোতে পারছে আর না বাড়িতে আমরা একটু শান্তি পাচ্ছি। সে দিন আমার অনুপস্থিতিতে আমার মিসেস আর অর্কর সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে ওরা, তার পর বিশ্বাস করুন, আমরা ভীষণ রকম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে কি বাঁচা যায়? আপনারাই বলুন? তার চেয়ে অনেক ভাল হবে এই বেলা অর্ককে অন্য কোনও স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিই। স্কুল একটু খারাপ হলে হোক, কিন্তু পরিবেশটা অন্তত ভাল হোক। আমার ছেলেটা যেন একটু হেসে-খেলে বাঁচতে পারে। এখানে ঋকের সঙ্গে যুদ্ধ করে ও টিকতে পারবে না কিছুতেই। ঋকের বাবা পরমজিৎ এলাকার নেতা বলে, না থানা কোনও স্টেপ নিচ্ছে, আর না ছেলেরা অর্কের

সঙ্গে ঠিকমতো মিশছে।”

“মি. চৌধুরী, আপনাকে আমরা কথা দিচ্ছি এর পর থেকে ঋকের কোনও বেয়াদবি বরদাস্ত করা হবে না। ওর কোনও অন্যায় দেখলেই আমরা এ বার থেকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। আর আমাদের কাছে যতটুকু খবর আছে, তাতে মনে হয় ঋকের বাবা পরমজিৎ উপাধ্যায় আর বেশিদিন এলাকায় নেতাগিরি করতে পারবেন না।”

সিদ্ধার্থ এত খবর জানতেন না। তাই কিন্তু কিন্তু করে বললেন, “কেন? ”

“সে কী! সেই খবরও জানেন না? আপনাদের বিড়ালের কামড় খেয়ে ওর মুখে যা ইনফেকশন হয়েছে, তা যে কবে সারবে কে জানে!”
“সে কী! আশ্চর্য!”

“বিষয়টা সত্যিই আশ্চর্যেরই বটে। ডাক্তাররাও শুনেছি হতবাক হয়ে গেছেন। বিড়ালের কামড় থেকে যে এমন সাংঘাতিক সংক্রমণ হতে পারে, জানা ছিল না ওঁদের। সাধারণত, বাঘে কামড়ালে এমন ইনফেকশন সম্ভব। আর তা ছাড়া, পরমজিৎ শুধু শারীরিক ভাবেই নয়, মানসিক ভাবেও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।”
“মানসিক ভাবে! মানে?” এ বার তিনি বেশ অবাক হয়ে গেছেন।

“হ্যাঁ সিদ্ধার্থবাবু। এখন তো শুনতে পাচ্ছি বিড়ালকে তিনি এমনিতেই ভয় পেতেন। নেহাত ঋকের চাপে পড়ে আপনাদের বিড়ালটাকে আনার জন্যে অমন মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে বিড়ালের প্রতি ওঁর ভয় আতঙ্কের আকার নিয়েছে। সব মিলিয়ে উনি ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। শুনছি তো মনোবিদেরও শরণাপন্ন হয়েছেন। এমন লোক কি আর নেতা থাকতে পারেন? বোঝেনই তো! তবে, যা হয়েছে একদম উচিত কাজ হয়েছে। আসলে ঈশ্বর বলেও তো একটা শক্তি আছে না কি! আপনাদের মতো ভাল মানুষদের ক্ষতি করার চেষ্টা করলে এমনটাই হবে। এটাই স্বাভাবিক।”

অবাক, বিহ্বল হয়ে শুনছেন সিদ্ধার্থ। এ সব কথা সত্যিই তিনি জানতেন না। জানবেনই বা কোথা থেকে। ভোরবেলা নাকে-মুখে দুটো গুঁজেই অফিসে ছোটেন। তার পর অফিস থেকে ফিরতে ফিরতেই সন্ধে শেষ হয়ে রাত নামে। এসেই আবার অর্ককে নিয়ে একটু বসতে হয়। অঙ্ক ছাড়া আর কোনও বিষয়ের শিক্ষক নেই

ছেলেটার। তিনিও যদি একটু না-দেখেন, তা হলে কী করে হয়। তাই বাইরের খবর চালাচালি করার সময়, ইচ্ছে বা প্রয়োজন কোনটাই তাঁর হয় না।

নিখিলেশ স্যর এখনও বলে চলেছেন, "এত দিন নেতা ছিলেন বলে ভদ্রলোককে একটু সমঝে চলতে বাধ্য হতাম আমরা। যা-ই হোক, আমরা বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখছি। নোটিশ পাঠাচ্ছি অর্কদের সেকশনে," কথাটা বলেই উনি একটা বেল টিপে ওঁর সহকারীকে বললেন, "এক্ষুনি সন্তোষ স্যরকে ডেকে দাও।"

সিদ্ধার্থ জানেন, সন্তোষ স্যরই অর্কদের ক্লাস টিচার। তাই যে-কোনও কাজ করতে গেলে, সন্তোষ স্যরের হাত দিয়েই করতে হবে। ওঁর বলার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সন্তোষ স্যর অফিস রুমে ঢুকলেন। প্রিন্সিপাল স্যর ওঁর সঙ্গে আলাদা করে কী সব যেন কথা বললেন। তার পর সন্তোষ স্যর সিদ্ধার্থর পাশের চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, "যদি আরও ভাল কোনও স্কুলে সুযোগ আসে, আমরাই ভর্তির ব্যবস্থা করে দেব অর্ককে। অর্ক শুধু পড়াশোনায় নয়, নানা দিক থেকে এক জন ভাল মানুষ হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়েছে বার বার। উই আর রিয়েলি প্রাউড অব হিম। ওকে আমাদের এখান থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার কথা ভাববেন না প্লিজ়।"

সিদ্ধার্থ শান্ত কণ্ঠে বললেন, "বেশ। আপনারা যখন বলছেন, তখন এ বারের মতো আর কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না। তবে পরবর্তী কালে অন্য ছেলেরা, বিশেষত ঋক যদি কোনও ভাবে অর্ককে হ্যারাস করে, তখন কিন্তু আপনাদের অনুরোধ রাখতে পারব না। কারণ, আমার ছেলের ভাল-মন্দের প্রায়োরিটি আমার কাছে সবচেয়ে বেশি দরকারি।"

অঙ্কের ক্লাস নিচ্ছেন কৌশিক স্যর। অর্ক খুব মন দিয়ে একটা অঙ্ক মেলানোর চেষ্টা করে চলেছে। এমন সময়ে সন্তোষ স্যর ঢুকলেন। স্যর ঢুকতেই সবাই নিজের জায়গায় উঠে দাঁড়াল। স্যর কড়া চোখে ছেলেদের দিকে কিছু ক্ষণ তাকিয়ে থেকে তার পর বললেন, "তোমাদের সবার উদ্দেশে বলছি, স্পেশ্যালি ঋককে নামোল্লেখ করে বলছি, অর্কর সঙ্গে আর যদি কাউকে খারাপ ব্যবহার করতে দেখি, তা হলে আর কোনও অবস্থাতেই সে শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। সেই পানিশমেন্ট স্কুল থেকে রাস্টিকেট করাও হতে পারে। এটা আমার লাস্ট ওয়ার্নিং। মাইন্ড ইট! আর ঋক, তোমাকে বলছি, অর্ক কিংবা অন্য কারও জিনিস যদি তোমার ভাল লাগে—

অনলাইন হোক বা অফলাইনে সেটা বা সেই ধরনের জিনিস কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা করে নেবে। আর কোনও দিনও আমরা যেন শুনতে না পাই, জোর করে তুমি অন্যের কোনও প্রিয় জিনিস আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছ। আর ঋক সহ সবাইকে আরও এক বার মনে করিয়ে দিচ্ছি, অর্ক তোমাদের বন্ধু। তোমাদের সহপাঠী। ওকে অকারণে অপমান করবে না। সবাই ওর সঙ্গে বন্ধু সুলভ আচরণ করবে। এই কথার অন্যথা যে বা যারা করবে, তাদের বিনা বাক্যব্যয়ে এই স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।”

সন্তোষ স্যর ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতেই একটা গুঞ্জন সাময়িক ভাবে তৈরি হয়ে কিছু ক্ষণের মধ্যেই থেমে গেল। কৌশিক স্যারের ক্লাসের পর থেকে অর্ক অবাক হয়ে লক্ষ করল, ছেলের দল তাদের অতি প্রিয় ঋককে কেমন যেন এড়িয়ে চলছে। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, তারা অর্ককে সমীহের চোখে দেখছে। বেশ সমঝে চলছে। যেচেই এ-ও তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে। অর্ক টিফিনের সময় পরিষ্কার দেখল, ঋক তার স্বভাবোচিত ভঙ্গিতে দীপ্তেশ, আনন্দ, উজানকে ডাক দিতেই ওরা সবাই-ই এক এক করে কোনও না-কোনও অজুহাতে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সেই ঘটনার পরে এক মাস কেটে গেছে। রকির কামড়ে ঋকের বাবা পরমজিতের যে সংক্রমণ হয়েছে, সেটা এখনও কমেনি। পরমজিতের জন্য হাসপাতালে মেডিক্যাল বোর্ড বসেছে। তাঁরা জানিয়েছেন, এমন সংক্রমণ যে কোনও বিড়ালের দাঁতের কামড় থেকে হতে পারে, তা তাঁরা এর আগে কক্ষনও দেখেননি। পরমজিৎ এতটাই ভয় পেয়ে আছেন যে, ঘুমের মধ্যেও বার বার চিৎকার করে উঠছেন। ঘুমের ওষুধ খেয়েও পরিমিত ঘুমোতে পারছেন না। এ দিকে ঋকের মা রকির জন্যে ঋকের পাগলামির বিরুদ্ধে চলে গেছেন। ওর মা'র মনে হচ্ছে, রকিই আসলে একটা অপয়া, অলক্ষুনে বিড়াল। ঋক যদি ওই বিড়ালটাকে বাড়ি নিয়ে আসার জন্যে অমন পাগল হয়ে না উঠত, তবে তার বাবার জীবনে, তাদের পরিবারে এমন বিপর্যয় নেমে আসত না। তাই তিনিও আর ঋককে সমর্থন করতে পারছেন না। পুরো ঘটনার জন্যে ঋককেই তিনি কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

গোটা ক্লাসেই এই সব খবর কানাঘুষোয় উড়ে বেড়াচ্ছে। অর্ক একটা ব্যাপার বুঝতে পারছে যে ঋক ঘরে-বাইরে, স্কুলে সব জায়গাতেই বেশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। সব সময় সে যেন কেমন উদাস হয়ে

থাকে। কেউই স্বাভাবিক ভাবে তার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। ওর বাবার আকস্মিক এই পরিণতি, স্কুলের বন্ধুদের ব্যবহারে হঠাৎ ছন্দপতন, স্কুলের স্যারেদের দিক থেকে হঠাৎ তৈরি হওয়া প্রতিরোধ... সব ঘটনা একই সঙ্গে ঘটার ফলে ঋক যেন কেমন বেসামাল হয়ে গেছে। তার চোখে-মুখে সেই
ছাপ স্পষ্ট। কিছুতেই আজকাল আর সেই আগের উদ্যমটা পায় না।

অর্ক নিজেকেও অবশ্য বেশ কিছুটা পাল্টে নিয়েছে। আগের মতো স্কুলে এসে গাছের সঙ্গে, পশু-প্রাণীদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের গল্প বন্ধুদের সঙ্গে করে না। কারণ, এখন অর্ক বেশ ভালমতোই বুঝতে পেরেছে যে, সবাইকে এ সব কথা বলা যায় না। বলা উচিত নয়। এ সব সত্যি ঘটনাকে অনেকেই তার পাগলামি বলে মনে করবে। আর তা ছাড়া রকির মতো নিঃস্বার্থ বন্ধু পাওয়ার পর তার এলোমেলো কথা শোনার জন্যে রকিই যথেষ্ট। সে সব কথা অন্য কারও সঙ্গে ভাগ করার কোনও প্রয়োজনও নেই। রকিকে পেয়ে সে সত্যিই ধন্য। এমন বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের বিষয়। রকি তার কাছে ভগবানের এক আশ্চর্য আশীর্বাদ।

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছে অর্ক। স্কুলের পরিবেশ বদলে যাওয়ার পর থেকে আজকাল অর্ক সব সময়ই বেশ হাসি-খুশি থাকে। গুন গুন করে গান গাইছে সে। ঘরে ঢুকে দেখল রকি তার বালিশটাকে কামড়ে কামড়ে খেলছে। তার কামড়ে বালিশটার অবশ্য কোনওই ক্ষতি হচ্ছে না। অর্ক হাত-মুখ ধুয়ে রকিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল, “কী রে রকি, অমন বাঘের মতো কামড়ালি কী করে ঋকের বাবাকে? অমন করে নাকি কখনওই কোনও বিড়ালের পক্ষে কামড়ানো সম্ভব নয়! এটাও কি তা হলে তোর কোনও বিশেষ ক্ষমতা?”

রকি উত্তর না-দিয়ে তার মুখটা অর্কর কাঁধে আরও কিছুটা আরামদায়ক ভাবে রাখল। অর্ক আবারও বলে উঠল, "জানিস রকি, তোর জন্যেই আমার জীবনে আবার সবটা স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এসেছে। থ্যাঙ্ক ইউ রকি। থ্যাঙ্ক ইউ।"

অর্ক অবাক হয়ে শুনল রকি বলছে, 'আসলে তুমি নিজেই খুব ভাল। তাই সবাইকেই তোমার ভাল বলে মনে হয়। একটা মানুষ কতটা ভাল হলে কাঁটার উপর পড়ে থাকা ক্ষত-বিক্ষত কালো কুচকুচে বিড়ালকে নিজের বাড়ি নিয়ে আসতে পারে, সেটা কখনও ভেবে দেখেছ? তুমি না-আনলে শিয়াল-কুকুর আমায় ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত অথবা না-খেতে পেয়ে এমনিই মরে যেতাম। তুমিই আমার রক্ষাকর্তা। থ্যাঙ্ক ইউ অর্কদা।'

চোখ গোল গোল করে অর্ক চেয়ে আছে রকির দিকে। সে এতটা অবাক এই কারণে হয়েছে যে, রকি এতটা কথা মিউ মিউ করে বলেনি। সে কথাগুলো বলেছে পুরো মানুষের মতো করে। অর্থাৎ হরবোলা করে। এর আগে দু'-চারটে শব্দ ছাড়া বিশেষ কিছু বলেনি সে রকম। আজ এতটা কথা এক সঙ্গে বলেছে সে। তার মানে হরবোলা বিদ্যেয় সে আরও অনেক বেশি পারদর্শী হয়ে উঠেছে। অর্ক সস্নেহে রকির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ছবি: পিয়ালী বালা

আমার বন্ধু জিরিয়া

ভারী মজা হয়েছিল সে দিন। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা নাম-না-জানা ঝোরার পাশে এসেছিলাম। তার জলের নীচে লাল-নীল পাথর আর গোছা গোছা সবুজ চুলিয়া দুলছে। ঝোরার পাশে, গাছের ডাল-পাতায় গড়া নিচু নিচু তাঁবুর মতো অনেক বাড়ি।

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

এখন ঠিক দুপুরবেলা। বাইরে ঝিম ঝিম করছে রোদ। হাওয়া বইছে শনশন। পাক খেতে খেতে ঘোড়াপুলির জঙ্গলের দিকে শুকনো পাতাদের উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি সাবধানে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলাম এক বার। মা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে ঘুমোতে গেছে। বলে কি না, "নতুন জায়গা। চার দিকে ঘন জঙ্গল। তোর বাবার তো আর কাণ্ডজ্ঞান নেই, প্রোমোশন নিয়ে রাতাপানি থেকে এক্কেবারে এই গেঁয়ো জঙ্গলে এনে ফেলল! দুপুরে একা একা বেরোবি না টুসু, এই বলে দিলাম। ঘরে লক্ষ্মী হয়ে বোস। বিকেল হলে রামনিবাস গার্ড এসে বেড়াতে নিয়ে যাবে'খন।"

ইস, আমার বয়ে গেছে রামনিবাসের সঙ্গে বেড়াতে যেতে! সেই তো ইশকুলবাড়ি আর সিদ্ধিনাথের থান নিয়ে যাবে। চার পাশে এই যে এত বড় জঙ্গলটা, তাতে পা দিতে দেয় কখনও! বললেই বলবে, "নহি গুড়িয়া। জঙ্গল মে তেন্দুয়া হৈ। ফরেস্টার সাব গুসসা হোঙ্গে।"

যেন আমি তেন্দুয়ায় ভয় করি! রাতাপানিতে যখন ছিলাম, জঙ্গলের ভিতরেই কোয়ার্টারে থাকতে হত তো। সেখানে একলা একলা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াইনি?

আসলে ঘোড়াপুলির এই জঙ্গলটা নিয়ে আমার লোভ জাগিয়েছে তান্না। আমাদের ক্লাসেই পড়ে। সে গোন্দ জাতির মানুষ। জঙ্গলের হাড়হদ্দ তার চেনা। বলে, "এ জঙ্গল কত্ত বড়, তা জানিস? এই নুনিয়া গাঁয়ের ধার থেকে শুরু হয়ে ঘাঁটি উজিয়ে হু-ই বৈকুণ্ঠপুর সদর অবধি চলে গেছে। ওর মধ্যে এমন সব জায়গা আছে, যেখানে মানুষের পা পড়েনি। এমন সব মানুষ আছে, যাদের আমরা গোন্দরা অবধি চোখে দেখিনি কখনও।"

তা ওই শুনেই মাথায় মতলবটা ঘুর ঘুর করছে আমার কদ্দিন ধরেই। হাতের কাছে এ রকম একখানা জঙ্গল! আর সেখানে একখানা অভিযান করব না?

জঙ্গল অভিযান করার জন্য অনেক কিছু লাগে। তবে সব কিছু তো আর নেওয়া যাবে না! বাড়িতে বাবার বন্দুক, বড় টর্চ সব আছে। কিন্তু নিতে গেলে কুরুক্ষেত্র বাধবে। তবে নারকেলের দড়ি নিয়েছি খানিক। আর একটা দূরবিন। জন্মদিনে পেয়েছিলাম গত বার। দিব্যি একটা প্লাস্টিকের গোলাপি নল। তার এ দিকে চোখ রাখলেই দূরের গাছ, কাক সব কিছু কাছে চলে আসে।

ও ঘরে টং টং করে দুটো বাজল। মা উঠবে পাঁচটায়। তার মানে হাতে পাক্কা তিন ঘণ্টা। ওর মধ্যেই আর কিছু না-হোক একটা অজানা নদীটদি তো অন্তত খুঁজে পাওয়া যাবে! কাজেই, আস্তে আস্তে জানালাটার কাছে গিয়ে ওর মধ্যের শিকটা ধরে আলতো করে টান দিলাম। শিকটা আলগা, সেটা আগেই খেয়াল করেছিলাম। মাকে অবশ্যই বলিনি।

ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে নীচে নেমে আসা গেল। খালি পা তেতে-ওঠা পাথরে জ্বলছিল অবশ্য। তবে অভিযাত্রীদের অমন কষ্ট একটু-আধটু হয়ই। উঠে দাঁড়িয়ে শিকটাকে আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিলাম।তার পর উঁচু-নিচু ঢেউ খেলানো লালচে পাথরের মাঠ পেরিয়ে ছুট... ছুট... ছুট...

জঙ্গলটা ভারী ঠান্ডা। বসন্তের মাঝামাঝি। গাছগুলোর পাতায় কত্ত রকমের রং! পায়ের নীচে মুসলি আর বুনো তুলসির ঝাড় শুকিয়ে উঠে কী যে সুন্দর গন্ধ ছাড়ছিল! সেই ভেঙে ভেঙে আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছিল, গাছের তলার লালচে পাথুরে মাটি আগুন হয়ে আছে পলাশের ফুল পড়ে। আবার এক বার দেখি একটা মহুয়া তলায় সাদা মহুয়া ফুলের আস্তরণ। দেখে মনে হচ্ছিল, যেন বরফ পড়েছে গাছতলায়।

এই সব দেখতে দেখতেই হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে যেতে হল আমাকে। ইয়া লম্বা একটা গাছ। তার গুঁড়ি দু'হাতের বেড়ে ধরা যায় না। বকুল পাতার মতো পাতায় ছাওয়া তার ডালপালায় সোনার ফোঁটার মতো অনেক অনেক ফল হাওয়ায় দুলছে। দেখে আমার খুশি ধরে না। এ যে ক্ষিরণী গাছ! আমি চিনি। ক্ষিরণী ফলের ভিতরে তুলতুলে শাঁস, খেতে যেন পায়েস!

অমনি আমি অভিযান-টভিযান ভুলে গিয়ে ক'টা নুড়িপাথর কুড়িয়ে নিলাম।

খানিক বাদে ঢিলটিল মেরে ব্যর্থ হয়ে গাছতলাটায় বসে বসে ভাবছি, হেই ভগবান, দুটো ক্ষিরণী নীচে ফেলে দাও, আমি খাই! ভারী খিদে পেয়েছে যে! তা তখন হঠাৎ মাথার উপর মট মট করে আওয়াজ হল আর অমনি ঝুপ করে ফলভর্তি একখানা ডাল দেখি আমার সামনে এসে পড়েছে।

ভেবেছিলাম ভগবান আমার কথা শুনেছে। খুশি খুশি মনে ডালটা থেকে একখানা ক্ষিরণী ছিঁড়েছি কী ছিঁড়িনি, অমনি গাছের উপর থেকে ক্যা-ক্যা করে অবিকল ময়ূরের ডাকের মতো শব্দ উঠল একটা। আর সঙ্গে সঙ্গেই সেখান থেকে একটা ছেলে অবিকল কাঠবিড়ালির মতো নেমে এসে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডালটা কেড়ে নিয়েছে।

ছেলেটা আমার চেয়ে একটু ছোটই হবে। মাথাতেও খাটো। আমারই মতো কালোকোলো, রোগাভোগা। তবে কেঠো শরীরটায় তার জোর নেহাত কম নয়। খালি গা। কোমরে গাছের পাতা জুড়ে তৈরি একটা কৌপীন গাছের ছালের বেল্ট দিয়ে বাঁধা। গালে আর কপালে লালে-সাদায় দাগ। ডান হাতে ছোট্ট একটা ময়ূরের উল্কি। কোন ফাঁকে গাছে উঠে সে ক্ষিরণীর ডাল ভাঙছিল। সেই সম্পত্তি আমি নিয়ে নেওয়ার মতলব করায় ভারী রেগে উঠেছে সে।

আমারও রাগ হয়ে গেছে তখন। নিয়েছিই না হয় দুটো ক্ষিরণী। তাতে কী হল! তুই তো গাছ বাইতে পারিস, যত খুশি নে! কে মানা করেছে?

উঠে দাঁড়িয়ে তার কানটা মুলে দিয়ে ডালটা কেড়ে নিতে যাব, তো সে ফের জড়িয়ে-মড়িয়ে কী যেন বলে কোমরের বেল্ট থেকে একটা খুদে কাস্তে মতো বের করে আমার দিকে তেড়ে এসেছে।

রক্তারক্তি কাণ্ডই হয়ে যেত একটা সে দিন। হল না যে, তার কারণ, ছোকরার চেঁচামেচি শুনে তত ক্ষণে আরও দু'জন বেরিয়ে এসেছে। তারা বড়। বোধ হয় ছেলেটার বাপ-মা। পোশাক-আশাক, মুখে মাখা রং ছেলেটারই মতো। বাবার কাঁধে গাছের ছালের ফাঁসে আটকানো একটা শজারু, আর মায়ের হাতে পাতায় জড়ানো এক টুকরো মৌচাক। তাতে তখনও দু'-একটা মৌমাছি লেগে।

আমায় দেখে তো তারা অবাক। তার পর ওর মা আমার কাছে এসে মুখটা তুলে ধরে দেখল। খরখরে হাত, কিন্তু ছোঁয়াটা ভারী মিষ্টি। সে বোধ হয় টের পেয়েছিল, আমার খিদে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে কী সব ভাষায় বকে-টকে ক্ষিরণীর ডালটা আমাদের দু'জনের সামনে ফেলে দিয়ে হেসে বলল, “খাও,” মানে বাংলায় বলল না। তারা সে ভাষা জানবেই বা কী করে? কিন্তু অচেনা ভাষা হলেও দিব্যি বুঝে গেলাম।

ভারী মজা হয়েছিল সে দিন। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা নাম-না-জানা ঝোরার পাশে এসেছিলাম। তার জলের নীচে লাল-নীল পাথর আর গোছা গোছা সবুজ চুলিয়া দুলছে। ঝোরার পাশে, গাছের ডাল-পাতায় গড়া নিচু নিচু তাঁবুর মতো অনেক বাড়ি। সবই ভাঙচোরা, ফাঁকা। কেবল তাদের একখানা নানান বুনো ফুল দিয়ে সাজানো। সুন্দর। এটাই জিরিয়াদের বাড়ি। ওহো, বলতে ভুলেছি। আসতে আসতেই আমাদের ভাব হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটা নিজের বুকে হাত ঠেকিয়ে বলেছিল, “জিরিয়া... জিরিয়া...” আমিও আমার বুকে হাত রেখে বলেছিলাম, “টম... টম...”

ওহো, বলতে ভুলেছি। আসতে আসতেই আমাদের ভাব হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটা নিজের বুকে হাত ঠেকিয়ে বলেছিল, “জিরিয়া... জিরিয়া...” আমিও আমার বুকে হাত রেখে বলেছিলাম, “টুসু... টুসু...”

বাড়িতে এসে এত্ত এত্ত ক্ষিরণী, ভেলা ফল, কেঁদ, পাতায় সেঁকা শজারুর মাংস এই সব খাওয়া হল। তার পর সবাই মিলে নাচ হল। সে ভারী সুন্দর নাচ। তাদের সব্বার ডান হাতে একটা করে উল্কি। কারও ময়ূর, কারও তেন্দুয়া, কারও বা শেয়াল। যার হাতে যে উল্কি, সে সেই জন্তু সাজল। আমার হাতে তো উল্কি নেই। তাও আমি আমাদের পোষা বিল্লি ঘ্যাঁঘা সাজলাম। উঠোনজোড়া কেঁদ, শাল, কুসুমের গাছগুলো হল আমাদের বন। তার ফাঁকে ফাঁকে বিল্লির মিয়াও, শিয়ালের হুক্কা হুয়া, তেন্দুয়ার গড়গড়... এমন সব ডাক উঠল সারা বিকেল।

তার পর নাচটাচ শেষ হতে সূর্য যখন পাটে বসছে, তখন জিরিয়ার বাবা আমাকে কোলে করে জঙ্গল পেরিয়ে নুনিয়া গাঁয়ের ধারে নামিয়ে দিয়ে আবার জঙ্গলে ফিরে গেল। কত্ত বললাম, “আমার সঙ্গে বাড়িতে এসো।” এলই না! শুধু হেসে হেসে মাথা নাড়ল, তার পর অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল।

বাড়ি এসে সে দিন ভারী বকুনি খেতে হয়েছিল। সব কিছু শুনে মা মুখ ভার করে বলেছিল, “এরা জুয়ালি। ভীষণ হিংস্র বনের মানুষ। ওরা মনে করে জঙ্গলের এক-এক রকম জীবের আত্মা ওদের এক-এক জনের মধ্যে বাস করে। ভাগ্যিস তোকে কিছু করেনি!”

বাবা বলেছিল, “এক সময় এ-জঙ্গল ওদের রাজত্ব ছিল। এখন আর নেই। দু’-একটা পরিবার কেবল লুকিয়ে লুকিয়ে টিকে আছে। কোথায় ঘাঁটিটা আমায় দেখিয়ে দিতে পারবি?”

আমি ঠোঁট উল্টে মাথা নেড়েছিলাম। বাবাদের বিশ্বাস নেই। বন্দুক আছে তো!

॥ ২ ॥

তার পর তো ইশকুল, পড়াশোনা, বাবার সঙ্গে এ-জঙ্গল ও-জঙ্গল ঘোরা এই নিয়ে মেতে গিয়ে ওদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু জিরিয়া আমাকে ভোলেনি। সেটা জেনেছিলাম অনেক পরে। ফের এক বার ওর সঙ্গে দেখা হতে। এই ঘোড়াপুলিতেই।

আমি তখন পুলিশ বিভাগে যোগ দিয়ে বৈকুণ্ঠপুর সদরে ডিএসপি। এই সময় কাগজে ঘোড়াপুলি থানার একটা কেস আমার নজরে আসে। ঘটনা হল, ঘোড়াপুলি টাউনশিপের থেকে কিছু দূরে জঙ্গল কেটে একটা তামার খনি বসছে। সেখানে কুলিদের রান্না-তাঁবু থেকে মাঝে-মাঝেই হাঁস-মুরগি চুরি যাচ্ছিল। ভাবা গিয়েছিল তেন্দুয়া-টেন্দুয়া কিছু হবে। ফলে ওরা সতর্ক হয়ে নজর রাখা শুরু করে। দিন তিনেক আগে গভীর রাতে নজরদাররা খোঁয়াড় থেকে অন্ধকারে চার পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে কিছু একটাকে বেরোতে দেখে গুলি করেছিল। তাতে প্রাণীটা হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে, তার পর ফের ঝুঁকে পড়ে জঙ্গলের দিকে পালায়। গুলিটা তার গায়ে লেগেছিল, কারণ জায়গাটায় রক্তের দাগ দেখা গেছে।

এর পর জঙ্গলে খোঁজারুরা গিয়ে অনেক খুঁজেও কিছু পায়নি। কিন্তু ব্যাপারটা তারা পুলিশের নজরে এনেছে, কারণ অন্ধকারে ঠিক বোঝা না গেলেও, তাদের সন্দেহ চোর কোনও মানুষ হওয়া অসম্ভব নয়।

ঘোড়াপুলি নামটা শুনে হঠাৎ অনেক কিছু মনে পড়ে গেল। ছোটবেলার অনেকটাই আমার কেটেছে ওর বন-পাহাড়ে ঘুরে। সেই পার্বতী শুক্লা বিদ্যাপীঠ, সিদ্ধিনাথের থান, নুনিয়া গ্রাম, ঘোড়াপুলির বিস্তীর্ণ জঙ্গল... হঠাৎ করেই তাদের জন্য ভারী মন কেমন করে উঠেছিল। কাজেই এসপি সাহেবকে বলে কেসটার তদন্তের ভার চেয়ে নিলাম পর দিন। তার পর জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘোড়াপুলি ঢুকে মনটা খারাপ হয়ে গেল। নুনিয়া গ্রামটাই আর নেই। সেখানে এখন একটা গঞ্জ। ভিড়ভাট্টা, বাজার, শয়ে শয়ে টেম্পো-ট্রেকারের জ্বালায় পথ চলা দায়। ঘোড়াপুলির জঙ্গল তার সীমা ছেড়ে বহু দূরে সরে গেছে। দিগন্তের গায়ে তার সবুজ দাগটার দিক থেকে ঘন ধোঁয়া উঠছিল। নুনিয়া থানার এক সেপাই আমার সঙ্গে চলেছিল পথ দেখিয়ে। ধোঁয়াটার দিকে দেখিয়ে বলল, "ওই হল সুন্দররাজ কপার মাইনসের এলাকা।"

স্পটে পৌঁছে ওয়ার্ক ম্যানেজারের অফিসে গিয়ে রিপোর্ট-টিপোর্ট নিলাম। সে হেসে বলল, নুনিয়া থানা থেকে তদন্ত করা হয়েছে বিষয়টা। আশপাশের এলাকায় কোথাও কোনও মানুষ খোয়া যায়নি। কেউ আহতও হয়নি। খোঁজারুরা অন্ধকারে কী দেখতে কী দেখেছে! ও কোনও তেন্দুয়টেন্দুয়াই হবে। মানুষ নয়। থানার সেপাইও তাতে সায় দিল।

বুঝতে পারছিলাম আমার তদন্তের কিছু আর বাকি নেই এখানে। আসলে সেজন্য তো আসিওনি! এসেছি তো ওই অজুহাতে ছোটবেলার জায়গাটা এক বার ঘুরে যেতেই!

সদরের পুলিশ-সাহেবা এসেছেন। অতএব কোম্পানি ভাল লাঞ্চের বন্দোবস্ত করেছিল। লাঞ্চের পরে তাদের গেস্ট হাউসে আরামের বন্দোবস্তও চমৎকার। আমি তার সামান্য খেলাম, তার পর তাদের হাজারও ওজর-আপত্তি ঠেলে জঙ্গলের দিকে হাঁটা দিলাম। জিপ রয়ে গেল সেখানেই। বলে গেলাম, জঙ্গলে খানিক ঘুরে-ফিরে সন্ধের মুখে ফিরে বৈকুণ্ঠপুর রওনা দেব। আর, একলা যাচ্ছি বলে তাদের ভয়ের কোনও কারণ নেই। নিজেকে রক্ষা আমি করতে জানি। তা ছাড়া আমার বাবা এখানে ফরেস্টার ছিলেন। এ-জঙ্গল আমার চেনা জায়গা।

আনমনে হাঁটছিলাম বন-পথ ধরে। এ-বনের ভিতর দিয়ে এখন এঁকেবেঁকে নতুন একটা রাস্তা চলে গিয়েছে জঙ্গল চিরে। তার ধুলোর

বুকে ট্রাকের টায়ারের দাগ। তার বাতাসে পোড়া ডিজেলের গন্ধ ভাসে। সেই পথ ধরে খানিক এগিয়ে গিয়ে মন খারাপ হয়ে যেতে আমি পথ ছেড়ে বাঁ-দিকের একটা সরু ট্রেল ধরে একেবারে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

খানিক যেতেই শান্ত হয়ে এল চার পাশ। বাতাসে বুনো ঝোপঝাড়ের চেনা গন্ধ ফিরে এল। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে বিকেলের সোনা রোদ ঝরতে লাগল আমাকে ঘিরে। দেখতে পেলাম, মাথার উপরে জালে ভেসে থাকা চির-চেনা উড স্পাইডারদের লাল-কালো-হলদে শরীর। আমার চেনা ঘোড়াপুলির যেটুকু তখনও বাকি আছে, সে আবার ভালবেসে আমাকে জড়িয়ে নিল।

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে একটা ঝোরার কাছে এসে পড়েছি, খেয়াল করিনি। খেয়াল হল তার জলের টুং টাং কানে যেতে। গরমে ঘেমে উঠছিলাম আমি। তার বুকে নেমে ঠান্ডা জল তুলে নিলাম আঁজলা করে। আর তখনই খেয়াল হল, তার জলের নীচে সেই লাল-নীল পাথরের দল, আর স্রোতে মাথা দোলাচ্ছে রাশ রাশ সবুজ চুলিয়া!

হঠাৎ দু'চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এল আমার। এ-নদীকে আমি চিনি! আগেও এসেছি আমি এখানে! সব বিস্মৃতিকে সরিয়ে দিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে আসছিল আমার ছোটবেলা... ছোট্ট একটা মেয়ে... তাকে ঘিরে হরেক জীবজন্তুর ডাক তুলে নেচে যায় কয়েক জন মানুষ! তাদের গায়ে বিকেলের সোনারং রোদ!

আর ঠিক তখনই, নদীটার ধারে তখনও দাঁড়িয়ে থাকা একটা লতাপাতার কুঁড়ের ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে করুণ সুরে একটা ময়ূর ডেকে উঠল।

ডাকটা শুনে, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার! ময়ূর নয় এ... এ-ডাক আমি আগেও...

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কুঁড়েটার ধসে পড়া ডাল-পাতা সরিয়ে তার ভিতরে উঁকি দিলাম আমি।

ভিতরে পড়ে থাকা কঙ্কালসার মানুষটার শরীরে তখনও প্রাণ ছিল। তার পেটে একটা গুলির ছ্যাঁদা বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। শক্ত জান। তাই তখনও লড়ে যাচ্ছিল সে। কিন্তু তাকে দেখে আমি টের পাচ্ছিলাম, সে-লড়াই আর বেশি ক্ষণ নয়।

দুরু দুরু বুকে কাছে গিয়ে, মানুষটার ডান হাতটা তুলে ধরলাম আমি। সেখানে কুঁচকে ওঠা চামড়ার গায়ে আবছা একটা ময়ূরের উল্কি দেখা যায়।

আস্তে আস্তে তার পাশে বসে পড়ে মাথাটা কোলে তুলে নিলাম আমি। তার পর ডাকলাম, "জিরিয়া..."

ডাকটা শুনে চোখ দুটো তির তির করে কেঁপে উঠল তার। ঝাপসা চোখগুলো অনেক চেষ্টায় কুঁচকে উঠে আমার মুখটা দেখল। তার পর ঘড়ঘড়ে গলায় সে বলে উঠল, "টুসু... কেউ নেই..."

এদের ভাষার সঙ্গে গোন্দ ভাষার মিল আছে। বুঝতে অসুবিধে হয় না। এর পর যে কয়েক মিনিট বেঁচেছিল সে, তার মধ্যে থেমে থেমে যেটুকু বলেছিল তা থেকে বুঝেছিলাম, এক সময় এ-জঙ্গলের শাসক জুয়ালিদের মধ্যে অবশেষে এক মাত্র তার পরিবারটাই টিকে ছিল এই জঙ্গলে। তার পর রাস্তা এল। খনি এল। জঙ্গল থেকে খাবার শেষ হয়ে গেল। তার বাপ মরল, মা মরল। বেঁচে রইল কেবল সে একা। তখন, পেটের দায়ে রাতের অন্ধকারে সে মানুষের তাঁবুতে খাবার খুঁজতে যেত। তার পর এক দিন...

সে দিন তার প্রিয় বনের বুকেই তাকে গোর দিয়ে ফিরে এসেছিলাম আমি। কাউকে তার খবর দিইনি। কী লাভ? ছবি উঠবে, খবর

সে দিন তার প্রিয় বনের বুকেই তাকে গোর দিয়ে ফিরে এসেছিলাম আমি। কাউকে তার খবর দিইনি। কী লাভ? ছবি উঠবে, খবর হবে, কত মানুষ দুঃখ করবে, কিন্তু জিরিয়া তো আর ফিরে আসবে না! আর তো এ-জঙ্গলে কেউ ময়ূর হয়ে নাচবে না আপন মনে!

তোমরা যদি ঘোড়াপুলি যাও কখনও, দেখবে সেখানে এক মস্ত শহর। কত আলো, শপিং মল, কলেজ, অফিস! তার এক ধারে আকাশ জুড়ে তামার খনির চিমনির ধোঁয়া। রাতেও সেখানে আলোয় আলো হয়ে থাকে।

জঙ্গলটা একটু-আধটু আছে এখনও। এক কোণে। কোনও মতে। কিন্তু তার বুকে আর কোনও জুয়ালি বনের প্রাণী সেজে নাচের বোল তোলে না। তাতে অবশ্য আজকের ঘোড়াপুলি শহরের কোনও দুঃখ হয় না। সে তো জানেই না এখানে কখনও অন্য কেউ ছিল।

গল্প পাঠানোর নিয়মাবলি

▶ আনন্দমেলায় গল্প পাঠাতে হবে ডাকে কিংবা ইমেলে। পত্রিকা দফতরের রিসেপশনে এসেও গল্প জমা দিতে পারেন।

▶ ডাকে কিংবা দফতরে জমা দিলে গল্পটি হাতে লিখে কিংবা কম্পিউটারে কম্পোজ় করে প্রিন্ট আউট নিয়েও পাঠাতে পারেন। তবে লেখাটি মনোনীত হলে তখন কিন্তু ইউনিকোডে কম্পোজ় করা সফ্‌ট কপি পাঠাতে হবে। ইমেলে পাঠালে কিন্তু গল্পটিকে প্রথমেই ইউনিকোডে কম্পোজ় করেই পাঠাতে হবে।

▶ গল্পের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল/ ফোন নম্বর পাঠানো বাধ্যতামূলক।

▶ গল্পের শব্দসংখ্যা ১৫০০-র মধ্যে রাখাই ভাল।

▶ গল্পটি যেন মৌলিক হয়। অন্য কোনও গল্পের অনুবাদ কিংবা অনুসরণ কিংবা অনুকরণ হলেও চলবে না। এবং কোথাও যেন গল্পটি প্রকাশিত না হয়ে থাকে।

ছবি: সমরজিৎ রজক

সাধনার গুপ্ত কথা

অনুরাধা রাজি। কাজেই পুজোর দিন-ক্ষণ ঠিক হতে দেরি হল না। গরদের ধুতি, উত্তরীয় পরা এক ভদ্রলোক এলেন তাঁর দু'জন সহকারীকে নিয়ে। নির্দিষ্ট সময়ে খাতার পুজো শুরু হল। মন্ত্রোচ্চারণের শব্দে, ঘণ্টাধ্বনিতে বাড়ি মুখরিত হল।

অদিতি ভট্টাচার্য

অনিন্দ্য বললেন, “তুমি তো দেখছি আমাদের কোনও কথাই কানে তুলছ না মা! সেই যাবে তুমি ওখানে! এমনি যাবে যাও, কিন্তু ওই সব যজ্ঞটজ্ঞর মধ্যে জড়ানোর কী দরকার?”

“যার জন্যে চুরি করি সে-ই বলে চোর! কেন যাচ্ছি, জানিস না?” অনুরাধা ছেলেকে এক ধমকে চুপ করিয়ে দিলেন।

বোঝাই যাচ্ছিল যে, এ বার অনুরাধাকে তাঁর ইচ্ছে অনুসারে কাজ করতে না-দিলে বোধ হয় অন্ন-জল ত্যাগ করবেন। এমনিতেই তো চিন্তা-ভাবনায়, না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মুখ শুকিয়ে ফেলেছেন, চোখের তলায় পুরু এক পোঁচ কালিও পড়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত বছর খানেক আগে, যখন অনিন্দ্যরা নতুন বাড়িতে এলেন। ক'দিন পরেই চিকুর মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোল। সেটা ঠিক মনের মত হল না। অনিন্দ্য, সুচরিতা এর জন্যে চিকুর অত্যধিক ফুটবল-প্রীতিকেই দায়ী করলেন।

“এ দুটোকে নিয়ে আমাদের একেবারে পাগল পাগল অবস্থা! একটার মাথায় ফুটবল ছাড়া আর কিচ্ছু নেই, আর-একটার মাথায় রান্নাবান্নার ভূত,” অনিন্দ্য বললেন।

আর-একটা বলতে পিকু। রান্নাবান্নার দিকে তার বেজায় ঝোঁক। কত রকম যে রান্না করতে পারে! অনেক কিছু রেঁধে খাইয়েছে চিকু আর বন্ধুদের। তারা তো এক রকম নিশ্চিতই যে, পিকু এক দিন খুব নামকরা শেফ হবে। হায়ার সেকেন্ডারির পর পিকু ওর ইচ্ছের কথা বলেছিল। কিন্তু তা কি কেউ শুনলেন! শোনা তো দূরের কথা, অনিন্দ্য, সুচরিতা হাঁ-হাঁ করে উঠেছিলেন একেবারে, “ও আবার কী কথা! না, না, ও সব শেফটেফ হওয়া চলবে না।”

এমনকি অনুরাধা, যিনি অন্য সব কিছুতে নাতিদের পক্ষ অবলম্বন করেন তিনিও বললেন, "এ বংশে এ রকম কথা কেউ শোনেনি। একটু-আধটু চা, কফি করো, দুটো ভাত ফোটাতে শেখো, সে না হয় বুঝলাম কাজে লাগবে। এত রান্নাবান্নার শখ কেন?"

বড়দের কান বাঁচিয়ে পিকু ভাইকে বলেছিল, "আমাদের বাড়ির সবাই এত সেকেলে কেন বল তো?"

পিকুকে তাই কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে কলেজে ভর্তি হতে হয়েছে। নতুন বাড়িতে এসে ওদের দু'ভাইয়ের উপর বাবা-মা'র নজরদারি আরও বেড়েছে। লেখাপড়ায় এতটুকু ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। তবে পিকুও ঠিক করে রেখেছে, এ বার এ দিকে রান্নার কোনও অনুষ্ঠানের অডিশন হলে ও যাবেই।

এর মধ্যে এক দিন অনিন্দ্যর বাঁ-হাত ভাঙল। সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে। অস্ত্রোপচার করতে হল। অনুরাধার শরীর, বলতে নেই, এ বয়সেও দিব্যি ছিল, অসুখবিসুখ তেমন কিছু হত না। তিনিও ভুগতে লাগলেন। প্রথমে পড়লেন জ্বরে। অনুরাধা অনেক ভাবলেন, শেষ কবে ওঁর জ্বর হয়েছিল। দুই নাতিকে ধরে পুরনো সব ঘটনার কথা তুলে তুলে হিসেব করাতে লাগলেন। সে সব ঘটনা আবার ঠিক কোন সালের কোন মাসে হয়েছে, তা মাঝে মাঝে অনিন্দ্যকে জিজ্ঞেস করতে হচ্ছিল। দু'বার অনিন্দ্যর এক জেঠিমাকেও করতে হল। এত কাণ্ড করে পিকুর হিসেব দাঁড়াল, অনুরাধা বিয়াল্লিশ বছর আগে জ্বরে পড়েছিলেন, চিকুর হিসেবে উনচল্লিশ বছর। তিন বছরের তফাত। পিকু বলে ওর হিসেবটা ঠিক, চিকু বলে ওরটা।

সুচরিতা সারা বাড়ি মাথায় করে চেঁচালেন, "পড়াশোনার নাম নেই, সারা দিন ধরে উনচল্লিশ না বিয়াল্লিশ, এই হচ্ছে! কী করব আমি এদের নিয়ে!"

অনুরাধার জ্বর সারল তো কাশি শুরু হল। এ রকম একটা না-একটা লেগেই রইল। ওঁর ছোট বোনের বন্ধু মন্দিরা কাছেই থাকেন, তিনি বললেন, "তুমি তো আমার কথা শুনছই না অনুদি। আমি তো বললাম কেন হচ্ছে এ সব। এর একটা প্রতিকার করা দরকার।"

মন্দিরা কিসের কথা বলছেন অনুরাধা ভালই বুঝতে পারলেন।

এ বাড়িতে আসার ক'দিন পরের ঘটনা সেটা। ওঁর ঘরের কাঠের আলমারিটার উপরের তাকে কিছু পুরনো জিনিসপত্র রাখা আছে। বহু বছর ধরেই আছে। অনিন্দ্যর বাবা খুব যত্ন করে কাপড়ে মুড়িয়ে সে সব জিনিস রেখেছিলেন। চট করে কাউকে হাত দিতে দিতেন না। উনি মারা যাওয়ার পর অনুরাধা সে সব উপর উপর ঝেড়েঝুড়ে রাখতেন, কোনও দিন খুলে দেখেননি। অন্যান্য সব জিনিসের সঙ্গে সে সবও এল নতুন বাড়িতে। আলমারি গোছানোর সময় অনুরাধার মনে হল, এক বার খুলে দেখলে হয় না, কী আছে! যেমন ভাবা তেমন কাজ। কাপড়ের মোড়ক খুলতে প্রথমে বেরোল একটা রুদ্রাক্ষের মালা আর তার পর লাল শালুতে মোড়া একটা জিনিস। অনুরাধা সেটাকেও খুললেন। শালুর ভিতর থেকে বেরোল একটা খাতা। পুরনো খাতা। তার হলদে হয়ে যাওয়া পাতায় বড় বড় করে লেখা, 'সাধনার গুপ্ত কথা'। একেবারে প্রথম পাতাতেই। অনুরাধা পাতা ওল্টাতেই যাচ্ছিলেন, এমন সময় বিকট কড় কড় কড় কড় শব্দে কাছেপিঠে একটা বাজ পড়ল। অনুরাধা শুধু চমকে উঠলেন না, তাঁর সারা শরীর কেমন যেন শির শির করে উঠল। খাতাটা তো হাত থেকে পড়েই যাচ্ছিল, কোনও রকমে সামলে আবার লাল শালুতে মুড়ে কাপড়ের ভিতরে যেমন ছিল তেমন ঢুকিয়ে রাখলেন। রুদ্রাক্ষর মালার সঙ্গেই।

"ঠিক দেখলাম তো! সাধনার গুপ্ত কথা! বাবা রে!" বিড়বিড় করে নিজের মনেই বললেন। আরও কয়েকটা জিনিস ছিল, সে সব আর খুলে দেখার সাহস রইল না। অনুরাধা তাড়াতাড়ি সব আলমারির উপরের তাকে চালান করলেন। কথাটা বাড়ির সকলে জানলেন।

জানলেন।

“তোর ঠাকুরদা শুনেছি হরিদ্বারে গিয়ে কোন সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র নিয়েছিলেন। তিনি নাকি কী সব লিখেটিখে দিয়েছিলেন ওঁকে। এ সেই খাতা নয় তো?সাধনাটাধনার ব্যাপার যে, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। রুদ্রাক্ষর মালাও আছে,” অনুরাধা ছেলেকে বললেন।

“ঠাকুরদা ও সব পড়ে সাধনা করেছিলেন বলছ? হবে হয়তো। আমি অবশ্য কিছু জানি না,” অনিন্দ্য বললেন।

মন্দিরাও সব শুনলেন। শুনে কিন্তু ওঁর মুখ গম্ভীর হল, বললেন, “গুপ্ত কথা মানে বুঝলে তো অনুদি? গোপন কথা। মানে যে কথা সকলের জানার নয়। তাও আবার যে-সে কথা নয়। সাধনার কথা। ও খাতা কী ও রকম কাঠের আলমারিতে আর চারটে সাধারণ জিনিসের সঙ্গে রাখা উচিত?”

“কোথায় রাখব বলো? ও রকম করেই তো আজ বহু বছর রাখা আছে।”

“না, না, এ বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। মনটা কেমন খুঁত খুঁত করছে অনুদি।”

সে দিন আর এ নিয়ে আলোচনা এগোয়নি। এর পর পরই অনিন্দ্যর হাত ভাঙল, অনুরাধার শরীর খারাপ হল। শুধু তাই নয়, আরও কিছু দিন পরে পিকু, চিকুর আদরের বিড়াল মিউয়ের হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটল। বাড়ির সামনেই। সে রাস্তা পার হচ্ছিল, গাড়ির ধাক্কা খেল। প্রাণে বেঁচে গেল ঠিকই, কিন্তু মারাত্মক ভাবে আহত হল। তাকে নিয়েও দৌড়োদৌড়ি কিছু কম হল না। পিকু, চিকুর দৌলতে মিউয়ের কথা জানতে আর কারও বাকি নেই। ফলে অনিন্দ্যকে দেখতে যেমন আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব আসতে

লাগলেন, মিউকে দেখতে আসার লোকজনেরও বিরাম ছিল না। সে সব সামলাতে সামলাতে সুচরিতার অবস্থা কাহিল।

একটু ফুরসত পেয়ে এ বার অনুরাধাই ছুটলেন মন্দিরার কাছে।

“আমি তো আগেই বলেছিলাম অনুদি, আমার মনটা খুব খুঁতখুঁত করছে। ও জিনিস ওখানে রাখার নয়,” মন্দিরা বললেন।

“কিন্তু ও তো ও ভাবেই এত দিন আছে। কই কখনও তো কিছু হয়নি।”

“আগে হয়নি বলে, পরেও কখনও হবে না, তা কি হয়? তুমি এক দিন অনিয়ম করলে কিছু হল না, কিন্তু রোজ যদি অনিয়ম করো, সহ্য হবে? শরীর বিগড়োবে না? এ-ও তেমনি। আবার দেখো, যে জিনিসের যে স্থান। তুমি কি একটা সোনার হার যেখানে-সেখানে ফেলে রাখবে? রাখলে চুরি হবে, সে তোমারই ক্ষতি। ও জিনিসের ক্ষেত্রেও তাই। কাঠের আলমারি কি ওর যোগ্য স্থান?”

অকাট্য যুক্তি। অনুরাধার বেশ মনে ধরল কথাগুলো। তা ছাড়া মন্দিরা অনেক সাধুসঙ্গ করেছেন, এ সব বিষয়ে তাঁর বেশ জ্ঞান।

“তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আসছে পূর্ণিমাতে গুরুদেবের আশ্রমে যজ্ঞ হবে। সকলের মঙ্গলের জন্য। তুমিও চলো আমার সঙ্গে। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে,” অনুরাধার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে মন্দিরা বললেন।

সেই যজ্ঞ আগামী কাল। অনুরাধা যাবেনই, যদিও বাড়ির আর কারও তেমন ইচ্ছে নয়।

গিয়েছিলেন যত উৎসাহ- উদ্দীপনা নিয়ে, ফিরলেন যখন, তখন তার ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই।

“কী ভিড় বাবা! কোনও কাজই হল না! বসে থাকাই সার!” বললেন অনুরাধা।

“কী দরকার ছিল যাওয়ার?” অনিন্দ্য বললেন।

“এই এক কথা তোর! খাতাটার একটা গতি না-হলে যে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। মন্দিরা অবশ্য বলেছে ব্যবস্থা করবে। কথা দিয়েছে আমাকে।”

দেখা গেল মন্দিরা কথা দিলে কথা রাখেন। দু'দিন পরেই হন্তদন্ত হয়ে এলেন, “সব কথা বলেছি অনুদি। কিছুই না, পুজো করে খাতাটাকে তোমার ঠাকুরের আসনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার পর কী করতে হবে, সে উনিই বলবেন। ইনিও এক জন জ্ঞানীগুণী মানুষ। বলতে নেই, এ রকম অনেকের সঙ্গেই তো আমার জানাশোনা। তোমার বিপদের কথা শুনে উনি নিজেই এসে পুজো করতে রাজি হয়েছেন।”

অনুরাধা রাজি। কাজেই পুজোর দিন-ক্ষণ ঠিক হতে দেরি হল না। গরদের ধুতি, উত্তরীয় পরা এক ভদ্রলোক এলেন তাঁর দু'জন সহকারীকে নিয়ে। নির্দিষ্ট সময়ে খাতার পুজো শুরু হল। মন্ত্রোচ্চারণের শব্দে, ঘণ্টাধ্বনিতে বাড়ি মুখরিত হল। ষোড়শোপচারে নৈবেদ্য নিবেদন করা হল, যজ্ঞের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করল এ রকম পুজো ইদানীং কালে কোথাও দেখা যায়নি। এর পর কী করতে হবে, সে সবও ভদ্রলোক অনুরাধাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলে গেলেন।

“এত দিনে আমার খুঁতখুঁতুনিটা কাটল। তুমিও আর চিন্তা কোরো না অনুদি,” মন্দিরা বললেন।

কিছু দিন পরে সুচরিতা অনুরাধাকে বললেন, “চিকুটার দেখছি পড়াশোনায় মন হয়েছে। কাল কী একটা ফুটবল খেলা ছিল টিভিতে, অন্য সময় হলে তো টিভির সামনে থেকে নড়ানো যায় না, কাল দেখি এক বার দাঁড়িয়েই চলে গেল। পরীক্ষা পর্যন্ত এ রকম মন থাকলেই বাঁচি।”

অনুরাধা কিছু বললেন না, শুধু হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন।

এ রকম করেই কাটছিল দিন, সবাই বেশ নিশ্চিন্ত। এর মধ্যে পিকু এক দিন সকলকে চমকে দিল একটা খবর দিয়ে। রান্নার একটি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের অডিশন হয়েছিল কলকাতায়, পিকু সেখানে গেছিল এবং মনোনীতও হয়েছে। তাকে শিগগিরই মুম্বই যেতে হবে মূল অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। পিকুর তৈরি চিংড়ির পুর ভরা প্যাটি খেয়ে নাকি নামী শেফরাও মুগ্ধ।

“কিন্তু এ সব হল কবে? আমরা তো কিছুই জানি না,” সুচরিতা খুব অবাক হয়ে বললেন।

“তোমাদের বললে কি আর যেতে দিতে নাকি? খালি তো বলো ও সব রান্নাবান্না করে কী হবে? শুধু চিকু আর আমার বন্ধুরা জানত। দেখবে, এ বার থেকে আমাকেও টিভিতে দেখাবে,” পিকু বেশ হাসি হাসি মুখে বলল।

“বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিস বলে এই সব করলি তার মানে? এ ঠিক করিসনি,” বলা বাহুল্য অনিন্দ্যর ব্যাপারটা একেবারেই পছন্দ হয়নি।

দেখা গেল এ খবর আর গোপন নেই। অনেক ফোন আসতে লাগল, অনেকে এসে দেখা করে গেল। অনিন্দ্য, সুচরিতাকে অনেকে বেশ বকলেনও, “যার যে দিকে ঝোঁক সে দিকেই যেতে দেওয়া উচিত, বুঝলেন। মাসিমা না হয় আগেকার দিনের মানুষ, ওঁর আপত্তি থাকতে পারে, আপনাদের তো ওঁকে

আপনারা যে কোন মান্ধাতার আমলে পড়ে আছেন বুঝি না! একদম আটকাবেন না ছেলেকে।”

পিকু বেশ বুঝতে পারল এ বার আর কোনও বাধা নেই।

“ভাবলাম এ বার সব ঠিক হবে, ছেলেগুলোর পড়াশোনায় মন হবে, কিন্তু এ তো দেখছি উল্টো হল! সব নিয়মকানুন মেনেই তো পুজো করা হল, তাও এ রকম হল! লেখাপড়া ছেড়ে এখন রান্নাবান্না করবে ছেলেটা!” অনুরাধা নিজের মনেই বললেন।

“ভাগ্যিস পুজো করলে ঠাম্মা, তাই তো এত কিছু হল,” পিকু বলল।

নাতির কথাতেও অনুরাধা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, “মুম্বই যাচ্ছ বলে একেবারে সাপের পাঁচ পা দেখেছ, তাই না? ওই খাতা নিয়ে মজা করছ?”

“মজা আবার কোথায় করল দাদা?” এ বার চিকু বলল, “সবই তো খাতার জন্যে। না হলে অমন ফাটাফাটি চিংড়ির প্যাটি তৈরি হত কী করে? কী রে, সব বল না খুলে।”

“কী হচ্ছে কী চিকু!” সুচরিতা ধমকে উঠলেন।

“তোমাদের কী বলি বলো তো, মা? এক বার মলাট উল্টে যেই দেখলে খাতায় লেখা সাধনার গুপ্ত কথা, অমনি ভেবে নিলে সেই সন্ন্যাসীর খাতা, যিনি নাকি বাবার ঠাকুরদাকে কী সব লিখে-টিখে দিয়েছিলেন। শুনেছ কখনও কেউ এ রকম ভাবে সাধনার গোপন কথা খাতায় লিখে রাখে? কেউ আর ভয়ে খাতাটা খুলে দেখলেই না! ও খাতা সাধনা দেবী নামে কোনও ভদ্রমহিলার। তিনি নানা রকম রান্নার রেসিপি লিখে রেখেছেন খাতায়। যা দারুণ দারুণ সব রেসিপি!” পিকু বলল।

"কী বললি? ও খাতা কার? সাধনা..." বলেই অনুরাধা চুপ করে গেলেন।

"হ্যাঁ সাধনা দেবী। ভিতরের পাতায় এক জায়গায় লেখা আছে। কেন, তুমি চেনো নাকি?" চিকু জিজ্ঞেস করল।

"চিনি মানে? তোদের বাবার ঠাকুরমা। তোরা জানিস না নাকি?"

"তাই তো! এটা তো মনেই পড়েনি!" দু'ভাই এক সঙ্গে বলে উঠল।

অনুরাধার মুখটা কী রকম বেজার হল, বললেন, "রান্না করার শখ ছিল ওঁর। আমাদের রোজকার রান্না নয়, রকম রকম দেশি-বিদেশি রান্না। সে সব আবার লিখেও রাখতেন, দেখেছি দু'-এক বার। আমার শ্বশুরমশাই আবার এ সব একেবারে পছন্দ করতেন না। বলতেন, 'গেরস্ত ঘরে ডাল, ভাত, চচ্চড়ি হবে এ-ই যথেষ্ট, অত কায়দাকানুনের রান্নার কী দরকার?' উনি তাই লুকিয়ে লুকিয়ে করতেন, লুকিয়ে লুকিয়েই লিখে রাখতেন। পাশের বাড়ির এক গিন্নির সঙ্গে খুব ভাব ছিল, বেশির ভাগ তাদের বাড়িতেই করতেন। আমাকেও শেখাতে চেয়েছিলেন। তবে সত্যি কথা বলব, ও সব প্যাটিস-ফ্যাটিস, কোপ্তা-কাবাব, আরও কী সব রান্না, নামই মনে থাকে না- ও আমার ভাল লাগত না, শেখার ইচ্ছেও ছিল না। সেই বুঝেই বোধ হয় আর জোর করেননি। এ তার মানে ওঁরই খাতা! কিন্তু মালাটা কার? খাতার সঙ্গে ছিলই বা কেন? তোদের দাদু তো বলতেন এ সব ওঁর বাবার জিনিস।"

"হয়তো ইচ্ছে করেই রেখেছিলেন। যাতে তোমরা ওই সাধনা-টাধনার ব্যাপার ভেবে ভয়ে রেখে দাও, না হলে হয়তো ফেলেই দিতে!" পিকু বলল।

“তোরা জানলি কী করে?” অনিন্দ্য জানতে চাইলেন।

“প্রথমে কিছু মনে হয়নি, কিন্তু পুজোর পর চিকু বলল, ‘দাদা, ওই ভদ্রলোক তো আবার ঠাম্মাকে কী সব করার কথা বলে গেছেন। কী, সে তো ঠাম্মা বলছে না। জিজ্ঞেস করলেও বলছে না। পুজোর পর তো ঠাকুর বিসর্জন হয়ে যায়, খাতাও বিসর্জন দিয়ে দেবে না তো? তার আগে এক বার খুলে দেখলে হয় না ওতে কী লেখা আছে?’ দিনের বেলা তো ওর ধারে-কাছে ঘেঁষা যেত না। রাতে তোমরা ঘুমিয়ে পড়লে আমি আর চিকু শালু খুলে বের করলাম খাতাটা। খুলতেই দেখি, পাতার পর-পাতা শুধু রান্নার রেসিপি লেখা। খাতা তো সরানো যাবে না, অত টোকাও সম্ভব না, তাই মোবাইল ফোনে সব ক'টা পাতার ফটো তুলে রেখেছিলাম। সেইখান থেকে চিংড়ির প্যাটি করে জাজদেরও একেবারে তাক লাগিয়ে দিলাম!” বলল পিকু।

“যাই, মন্দিরাঠাম্মাকেও বলে আসি। এ সব উনি জানবেন না, তা কখনও হয়?” চিকু বলল।

“থাক, আর কিছু বলে কাজ নেই। তবে তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। রান্নাবান্নাই তো করতে চেয়েছিলে। আমার আর কী? বয়স হয়েছে, আজ আছি, কাল নেই, তোমাদের ভাল হলেই ভাল। ও খাতা ওখানেই থাক,” অনুরাধা দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন।

গল্প পাঠানোর নিয়মাবলি

ছবি: সুমন পাল

সাঁঝের ফেরি কথা

দীনবন্ধুবাবু বসে আছেন নৌকার প্রান্তে। সেই বখাটে চেহারার ছেলেটা বসে আছে মাঝামাঝি যায়গায়। তার পাশেই বটকেশ্বর বসে ঝিমোচ্ছে। নিতাই মাঝি কোন আপন চিন্তায় মগ্ন হয়ে অন্যমনস্কের মতো দাঁড় টেনে চলেছে। এমন সময় নৌকা দুলে উঠল।

উৎসব চট্টোপাধ্যায়

মিনি বাসটা যখন চিনাকুরি বাস স্ট্যান্ডে এসে থামল, সূর্য তখন পাটে নেমেছে। দামোদরের দুই পারে তখন ধোঁয়াশা জমছে। এ দিকের কয়লাখনির হেড-গিয়ারগুলো আর ও দিকের তাল, খেজুরের গাছগুলো এ বার আস্তে আস্তে দৃশ্যপট থেকে মুছে যাবে। নদের ধারে ভবানন্দের চায়ের দোকান। কোলিয়ারির ধাওড়ার পিছনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে সেখানে এসে দাঁড়ালেন দীনবন্ধু ঘোষ। অদূরেই নদের ঘাটে বাঁধা আছে নিতাই মাঝির খেয়া। প্রতি দিন সকাল-বিকেল বহু যাত্রী তার খেয়ায় নদ পারাপার করে। দীনবন্ধুবাবুর বাড়িও ও পারে।

নদের এ পারে পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বিস্তীর্ণ খনি অঞ্চল। ও পারে পুরুলিয়া আর বাঁকুড়া জেলা। সেখানে নদের পার বরাবর একের পর এক গ্রাম ও গঞ্জ। দু'পারেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বহু কয়লাখনি ও ছোট-বড় নানান কারখানা। এ পারে আসানসোল, বার্নপুর, দিসেরগড়ের মতো শিল্পাঞ্চলের আলোর মালা, ও পারে শুধুই অন্ধকার।
নৌকা ছাড়তে এখনও দেরি আছে। ভবানন্দ সবে চায়ের গেলাসটা দীনবন্ধুবাবুর হাতে দিয়েছে, এমন সময় পিছন থেকে একটা মিহি গলা ভেসে এল, "সার, ভাল আছেন?"

ঘাড় ঘুরিয়ে দীনবন্ধুবাবু দেখলেন বটু চোর এসে দাঁত বের করে হাসছে।

"কী হে বটু, কবে ছাড়া পেলে?"

"আজই পেইলম সার।"

রোগা চেহারার বটকেশ্বরের চোখ-মুখ যেন কিছুটা উজ্জ্বল। মাথায় ঝাঁকড়া চুলগুলো তেল চুকচুকে এবং বেশ পরিপাটি করে আঁচড়ানো।

"বাহ, জেলে বেশ ভালই খাতির-যত্ন পেয়েছ মনে হচ্ছে?" বললেন দীনবন্ধু।

হেঁ হেঁ করে হেসে বটু বলল, "মানে, কী বইলব সার, জেলেই ভাল থাকি। প্যাটের চিন্তা কইরতে হয় না কেনে।"

"তা এ বার ক'দিন হল?"

“ওই মাস খানেক হবেক সার,” বলে হেসে বটু বলল, “শীতকালটো আরামে কেইটে গেল। কম্বল মুড়ি দিয়ে আরামসে ঘুমাইলম। বাইরে থাইকলে বড় বেপদে পইড়তম, এ বছর বহুত জার পইড়েছিল।”

“চা খাবে?”
হাত কচলে বিগলিত হাসি হেসে বটু বলল, “সি যদি খাওয়ান তো...”
ভবানন্দকে বটুর জন্য চা আর বিস্কুট দিতে বলে তাকে পাশে বসিয়ে দীনবন্ধু বললেন, “তোমায় পাশে বসাতেও ভয় হয়।”
“কেন সার?”
“যে লোক খোদ পুলিশের বড়বাবুর পকেট কাটতে পারে, সে সব পারে।”

দাঁত বের করে হেসে বটু বলল, “লোভ সামলাইতে পাইরলম নাই, সার। নিয়ামতপুর বাজারে সকালবেলা দেখি বাজারের থলি হাতে বড়বাবু আইসছেন। গায়ে একটো ঢোলা পাঞ্জাবি। উয়ার পকেটটো হেঁই ভারী হইঁ ঝুইলছে। ঠিক বুঝেছি মোবাইল বটে। বড়বাবুর মোবাইল কী আর যে-সে মোবাইল সার, লাখ টাকা দাম উয়ার! মনে মনে বইললম ওহে বটকেশ্বর, তুমিও বাঁ হাতে কামাও, বড়বাবুও বাঁ হাতে কামায়। তাইলে আর দেরি কেনে, চুপ চাপ গেঁড়াই লাও!”

“সে তো বুঝলাম। কিন্তু ধরা পড়লে কী করে? আমি তোমায় মোক্ষম চিনি, তুমি তো মোটা দাগের কাজ করো না বাপু,” বললেন দীনবন্ধু।

ভবানন্দর দেওয়া বিস্কুটে কামড় দিয়ে, চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে বটু বলল, “মা কালীর দিব্যি সার, আমার পারা হাতসাফাই যদি হেঁই ইলাকায় আর কোনও মাই-কা-লাল করি দিখাইতে পারে, তো আমার নাম বটকেশ্বর লয়।”

“সে কথাই তো বলছি। তা হলে ধরা পড়লে কী করে?”
“কী আর বইলব সার, আমি আনপড় বটি, মোবাইলের ট্যাঁ ফুঁ তো বুঝি না। ওই কী বলে, লোকেশ... লোকেশ... ”
“লোকেশান?”

“হ, হ, ওই। ওই লোকেশ না কী বটে, ওই দেইখে ঠিক আমায় খুঁজি বের করে এক্কেবারে জিনিস সমেত গাড়িতে তুলে লিল।”

দীনবন্ধু হেসে বললেন, "বেশ করেছে। তা এ বার কী করবে? আবার পকেট কেটে বেড়াবে?"

"মা কালীর দিব্যি সার, বটু চোর ই বার পুরা জেন্টিলমান।"

"এই কথাটা তুমি এর আগেও বলেছ। তার পরেও চুরি করলে।"

"কী কইরব সার, সবই প্যাটের দায়ে। তবে আর লয়। ভাবছি ভামুড়িয়ার বাজারে সব্জি বেইচব।"

"বাহ," বললেন দীনবন্ধু, "খুব ভাল কথা।"

একটু চুপ করে থেকে বটু নিচু গলায় বলল, "কিন্তু একটো অন্য কথা বলি সার। আপনের বড় বেপদ!"

দীনবন্ধুবাবু অবাক হয়ে বটুর দিকে চেয়ে বললেন, "মানে?"

"জেলে বহুত মাকড়ার সাথে আলাপ হয় কেনে। উয়াদের কাছেই শুইনলম।"

"কী শুনলে?"

"আপনে ওই দু' লম্বরি খাদান লিয়ে কিছু লেখছেন?"

"হুম।"

"ওইখানেই বেপদ।"

"কী রকম?"

"এই যে রানিগঞ্জ, আসানসোল আর বাঁকুড়ার দু'লম্বরি খাদানগুলারে লিয়ে আপনে লেখছেন, উয়াতে গুন্ডাগুলা বেপদে পড়েছে," বলে গলাটা আরও এক ধাপ নামিয়ে বটু বলল, "উয়ারা যে কোনও দিন আপনেরে উড়াই দিবে।"

"ও, এই বিপদ?" বলে মৃদু হাসলেন দীনবন্ধু।

"আপনে হাইসছেন?" অবাক হয়ে বলল বটু।

"ওরে, আমি গত বিশ বছর ধরে এই বিপদ মাথায় নিয়ে ঘুরছি। আমার গায়ে হাত দেওয়ার মতো সাহস নেই ওদের। মারার হলে অনেক আগেই মেরে দিত," বলে আবার চায়ে চুমুক দিলেন তিনি। বটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে।

এ অঞ্চলে সরকারি কয়লাখনির পাশাপাশি ইতি-উতি ছড়িয়ে আছে বহু অবৈধ কয়লাখাদান। স্থানীয় মাফিয়ারা সেগুলো পরিচালনা করে। বহু রাজনৈতিক নেতারাও নাকি এদের পিছনে আছে। এরা কাউকে পরোয়া করে না। চোরাপথে শ্রমিকদের সেই খাদানে নামিয়ে কয়লা তুলে আনে তারা। এদের জন্যই জমিতে ধস নামে। সে এক অতি ভয়ানক ব্যাপার। কোনও রকম পূর্বাভাস ছাড়াই হঠাৎ করে অনেকটা জায়গা জুড়ে মাটি ধসে যায় অতল এক গহ্বরে। এমনও হয়েছে, রাতে হয়তো কোন গৃহস্থ স্ত্রী-সন্তান নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে, এমন সময় হঠাৎ ধস নামল। বাড়ি-ঘর সমেত গোটা পরিবার তলিয়ে গেল সেই ভয়ানক অন্ধকার গহ্বরে।

সরকারি খনিতে কয়লা কাটা হয়ে গেলে সেখানে নদের বালি বা শাল কাঠের খুঁটি দিয়ে শূন্য জায়গাটা প্যাক করে দেওয়া হয়। কিন্তু মাফিয়ারা সে সবের ধার ধারে না। কাজেই এই ভয়ানক দুর্ঘটনা। কত মানুষ যে হারিয়ে গেছে এই ধসে, তার কোনও হিসেব নেই। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধেই জনমত গড়ে তুলছেন অকুতোভয় সমাজকর্মী দীনবন্ধু ঘোষ। আসানসোল ও কলকাতার বিভিন্ন খবরের কাগজে তিনি নিয়মিত প্রতিবেদনও লিখে চলেছেন এই মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। স্বভাবতই তারা বিপদে পড়েছে। তাঁর খবরের প্রভাবেই গত সপ্তাহে পুলিশ এক জন ছোটখাটো মাফিয়াকে গ্রেফতার করেছে।

ইতিমধ্যে নিতাই মাঝি এসে হাজির হয়েছে। নৌকা ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে। সূর্যটা নদের উপর জমে থাকা ধোঁয়াশার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এ বার দ্রুত অন্ধকার নামবে। বটুকে দেখে নিতাই দীনবন্ধুবাবুর উদ্দেশে বলে উঠল, “পাশে কারে বসাইছেন কত্তা! ওরে ব্বাপরে বাপ!”

সে কথায় ভ্রুক্ষেপ না-করে বটু বলে উঠল, “কত দিন তুরে দেখি নাই রে লিতাই, পরানটো তুর লেগে আছাড়িপিছাড়ি কইরছিল।”

নিতাই হেসে উঠল। ইতিমধ্যে দিনান্তে ঘরে ফেরা কারখানা ও খনির শ্রমিকরা একে একে এসে নৌকায় উঠে পড়ছে। তাদের মধ্যে দিয়েই বিকট শব্দে একটা মোটরবাইক এসে দোকানের সামনে দাঁড়াল। পিছনের ছেলেটিকে নামিয়ে দিয়ে চালক আবার প্রচণ্ড শব্দ তুলে বাইক নিয়ে ফিরে গেল। ক্ষয়াটে চেহারার ছেলেটা এক মুখ পান-মশলার থুতু ফেলে এগিয়ে গেল নৌকার দিকে।

“সব ব্যাটা কয়লা পার্টি,” ছেলেটাকে উদ্দেশ করে চাপা গলায় বলল নিতাই।

“ছাড় উয়াদের কথা, ফালতু লোক সব। নৌকা ছাড়ার টাইম হইঞ্ছে। চলেন স্যার,” বলে বটু উঠে পড়ল।

“চলো, কিন্তু তোমাকেও এ বার এই কাজ ছাড়তে হবে,” বললেন দীনবন্ধু, “এ বার কিন্তু সৎ পথে আসা চাই।”

“আইসব সার। আলবাৎ আইসব। শুধু...” বলে বটু থেমে গেল।
“শুধু?” সন্দিহান হয়ে প্রশ্ন করলেন দীনবন্ধু।

“স্রেফ আর একটো হাতসাফাই কইরব সার। মা কালীর দিব্যি, উয়ার পর বটু চোর চুরি করা ছেইড়ে দিবেক।”
“মানে?” অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন দীনবন্ধু, “এ আবার কী কথা? লজ্জা করে না তোমার?” এ বার তাঁর গলায় সামান্য উষ্মা প্রকাশ পেয়েছে।

“আপনে বড় মানুষ, আপনেরে আমরা মান্যি করি। আপনের লেগে কত মানুষ লিজের হকের টাকা, জমি, কত কিছু ফিরে পায়।

"আপনে বড় মানুষ, আপনেরে আমরা মান্যি করি। আপনের লেগে কত মানুষ লিজের হকের টাকা, জমি, কত কিছু ফিরে পায়। আপনে না থাইকলে উ শয়তানগুলা সব হাতাই লিত। তাই আপনেরেই বইলছি সার, আমারে ক্ষমা কইরে দিবেন, কিন্তু স্রেফ আর একটো চুরি আমি কইরব। ই আমার কর্তব্য বটে!" এই কথা বলে অদ্ভুত ভাবে বটু চোর নিতাইকে নিয়ে এগিয়ে গেল তার নৌকার দিকে। সে দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন দীনবন্ধুবাবু। পর ক্ষণেই হুঁশ ফিরে পেয়ে ভবানন্দর চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে তিনিও গিয়ে নৌকায় উঠে পড়লেন।

শীত চলে গিয়ে বসন্ত এসেছে। ফাল্গুন মাস। এরই মধ্যে দিনের বাতাস তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। তবে সূর্যাস্তের পর থেকেই নদের হাওয়ায় বেশ একটা শিরশিরানি অনুভূত হয়। যাত্রীর চুপ করে নৌকোর গলুইতে বসে চেয়ে আছে দূর অজানার পানে। সারা দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমে সকলেই ক্লান্ত। সকলেই আপন চিন্তায় মগ্ন। মাঝনদে শুধু গভীর জলে নিতাই মাঝির ছপ ছপ দাঁড় বাওয়ার শব্দ। চিনাকুরির ঘাট ক্রমে দূর থেকে দূরে সরে আধো-অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। পুরুলিয়ার দিকের ভামুড়িয়া গ্রামের ঘাট আস্তে আস্তে ধোঁয়াশার ভিতর থেকে বেরিয়ে কাছে এগিয়ে আসছে। দীনবন্ধুবাবু বসে আছেন নৌকার প্রান্তে। সেই বখাটে চেহারার ছেলেটা বসে আছে মাঝামাঝি জায়গায়। তার পাশেই বটকেশ্বর বসে ঝিমোচ্ছে। নিতাই মাঝি কোন আপন চিন্তায় মগ্ন হয়ে অন্যমনস্কের মতো দাঁড় টেনে চলেছে।

এমন সময় নৌকা দুলে উঠল। আর পর ক্ষণেই ঘটে গেল এক ভীষণ কাণ্ড। লোকজন কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখল নৌকা হঠাৎ প্রবল বেগে নিজের গতিপথ থেকে সরে যাচ্ছে। নিতাই মাঝি চিৎকার করে উঠল, "সাবধান! সাবধান! ঘূর্ণি, ঘূর্ণি!" সেই দুলুনিতে লোকজন একে অন্যের ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। শ্রমিকরা ভয়ে চিৎকার জুড়ে দিল। নিতাই তখন দাঁতে দাঁত চেপে ঘূর্ণির সঙ্গে লড়াই শুরু করেছে। সে প্রাণপণে চেষ্টা করছে দাঁড়ের ঘা মেরে নৌকাটাকে সেই ভয়াল জলদানবের হাত থেকে মুক্ত করতে। না হলে আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই সব ক'টা মানুষকে নিয়ে গোটা নৌকা তলিয়ে যাবে মাঝ নদের গভীর জলে। দামোদরের ঘূর্ণি আর চোরাবালির কথা, কে না জানে। সে যদি এক বার কাউকে ধরে, তার আর রক্ষে নেই!

দীনবন্ধু চিৎকার করে সকলের উদ্দেশে বলতে থাকলেন, "তোমরা নোড়ো না, নোড়ো না! একে অন্যকে শক্ত করে ধরে বসে থাকো!"

প্রত্যেকে একে-ওপরকে তখন প্রাণভয়ে জাপটে ধরেছে। বটু সেই ক্ষয়াটে ছেলেটাকে জাপটে ধরেছিল, কিন্তু সে একটা খারাপ কথা বলে ওকে এক ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। এ দিকে নিতাই মাঝিও প্রাণপণে লড়াই করে অবশেষে নৌকাটাকে ঘূর্ণি থেকে বের করে আনল।

এত কাছ থেকে এমন ভয়ানক বিপদ দেখার পর মানুষের যা হয়, প্রায় সকলেরই তখন সেই অবস্থা। খোদ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে মানুষগুলো। কেউ কেউ তখন ভয়ে কাঁপছে, কেউ আতঙ্কে বাক্যহারা। ক্রমে নৌকা এসে ভামুড়িয়ার বালির চরে ভিড়তেই লোকজন যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল। তারা দ্রুত নৌকা থেকে বালির উপর নেমে হাঁটা দিল, যে-যার গন্তব্যের দিকে। শুধু দেখা গেল সেই বখাটে ছেলেটা বালিতে নেমে পকেট হাতড়ে কী যেন খুঁজছে।

"কিছু হারালে নাকি?" তাকে প্রশ্ন করলেন দীনবন্ধু।

"হাঁ?" তাঁর কথায় যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ছেলেটা। তার পর "নেহি, কুছ নেহি," বলে দ্রুত বালির উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল দূরে নদের বাঁধের উপর রাস্তাটার দিকে। তার এমন অদ্ভুত আচরণে অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলেন দীনবন্ধুবাবু। এই সময় নিতাই মাঝি তাঁর কাছে এসে বলল, "কী কত্তা, কেমন খেল দিখাইলম?"
"মানে?" চমকে উঠে বললেন দীনবন্ধুবাবু।

"বুইঝলেন লয়?" হেসে বলল নিতাই, "আজ বিস বরস হইঙ্গেলো এই লদে দাঁড় বাইছি। আমি জানি না কোথায় ঘূর্ণি আছে আর কোন ঘূর্ণিতে ঢুকলে বিরান যায় আর কোনটোয় যায় না?"

তার কথার কোনও অর্থ খুঁজে না-পেয়ে তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন দীনবন্ধুবাবু। তত ক্ষণে নদের বুকে অন্ধকার নেমে গেছে। এই সময় বটু এসে বলল, "সার, আজ আপনে জোর বেঁইচে গেলেন। উ ছেইলাটোই এসেছিল আপনেরে মাইরতে!"

"তোমাদের কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না," অসহায়ের মতো বললেন দীনবন্ধু।

"তবে বলি শুনেন," আস্তে আস্তে বলল বটু, "পরশু দিনই জেলে থাইকতে খবরটো পেঁইয়েছিলম, যে ইয়ারা আজ আপনারে ইখনে

শুট কইরবে। তখনই লিজেরে বইললম, ওহে বটকেশ্বর, জীবনে ভাল কাম কাজ তো কিছুই কইরলে নাই, ই বরে তো একটো মরদের পারা কাম করো হে! এই বলে জেল থেকে খালাস পেঁইয়েই চলি এলম ইখ্‌নে। আপনে রোজ এই সময় লদী পিরান, কেনে? উয়ারাও ই কথা জানে।"

"কারা, মাফিয়া?"

"আবার কারা? শয়তানের বাচ্চা! আপনেরে মাইরবে জানতম, কে মাইরবে সি খবরটো পাই লাই। কিন্তু এই ছিলাটোকে আইসতে দেইখেই বুইঝলম, ইয়াই ভিলেন বটে। ই লাইনে হাফ জীবন কাটাই দিলম সার, মুখ দেইখে বলি দিতে পারি কে রাম কে রাবণ," বলে একটু দম নিয়ে বটু বলল, "তখনই নিতাইরে বইললম, তু মাঝ লদীতে লাটকটো কর, আর আমি হাতসাফাইটো দিখাই।"

"নাটক, হাতসাফাই, এ সবের মানে কী?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন দীনবন্ধু।

"নাটক মানে ওই ঘূর্ণি। উ অল্প ঢেউ সার, লিতাইয়ের কাছে উ সব নস্যি বটেক। আর হাত সাফাই মানে..." বলে বটু ওর জামার তলা থেকে বের করে দীনবন্ধুর হাতে যেটা গুঁজে দিল সেটা একটা দেশি লেদ মেশিনে তৈরি ওয়ান-শটার পিস্তল! দীনবন্ধু হাঁ করে চেয়ে রইলেন সেটার দিকে।

বটু বলল, "উয়ার জামার গোঁজ দেইখেই বুঝে গেইছিলম লিচে কী আছে। তাই উয়ার পাশে যেঁইয়ে বইসলম। তার পর যেই না লিতাই নাটকটো শুরু কইরলো, আমি উয়াকে জাপটে ধরার আছিলায় দিলাম খেল দিখায়ে," বলে একটু থেমে বলল, "নইলে আপনে যেই না হুঁই অন্ধকার বাঁধের রাস্তাটোয় যেঁইয়ে উইঠতেন, উ পিছন থিকে দেগে দিত আপনেরে।"

দীনবন্ধুবাবু এ কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

দীনবন্ধুবাবু এ কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

একটু চুপ করে থেকে মৃদু হেসে বটু বলল, "বলি নাই সার, স্রেফ আর একটো চুরি কইরবক?"

দীনবন্ধু কী বলবেন ভেবে পেলেন না। নিতাই বলল, "আপনে সাবধানে থাইকবেন সার। আমরা চাইলে উ বেটাকে ঘূর্ণিতে ফেইলে দিতে পাইরতম, কিন্তু ফেইললম নাই। উ মইরে গেলে উয়ারা লতুন লোক পাঠাইত। তার থিকে ইয়াই থাকুক, আপনে উয়ার মুখ চিনে গেছেন।"

দীনবন্ধুর তখন এই দু'জন মানুষের উপর কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসে গেছে। এরা আজ না-থাকলে এত ক্ষণে ওঁর লাশ পড়ে থাকত বাঁধের রাস্তার উপর।
"ইব্রে ই পিস্তলটো লিয়ে আপনে যা ভাল বুঝেন করেন," বলল বটু।

দীনবন্ধুবাবু চোখের জল মুছে কিছু ক্ষণ তাদের দিকে চেয়ে রইলেন। তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃদু হেসে বললেন, "বহু দিন ব্যাঙবাজি খেলিনি জানো। সেই কোন ছেলেবেলায় খেলতাম!"

এই বলে পিস্তলটাকে সজোরে ছুড়ে দিলেন নদের জলে। অন্ধকারে ছপ করে শব্দ করে বন্দুকটা ডুবে গেল দামোদরের বুকে।

গল্প পাঠানোর নিয়মাবলি

- আনন্দমেলায় গল্প পাঠাতে হবে ডাকে কিংবা ইমেলে। পত্রিকা দফতরের রিসেপশনে এসেও গল্প জমা দিতে পারেন।
- ডাকে কিংবা দফতরে জমা দিলে গল্পটি হাতে লিখে কিংবা কম্পিউটারে কম্পোজ় করে প্রিন্ট আউট নিয়েও পাঠাতে পারেন। তবে লেখাটি মনোনীত হলে তখন কিন্তু ইউনিকোডে কম্পোজ় করা সফ্‌ট কপি পাঠাতে হবে। ইমেলে পাঠালে কিন্তু গল্পটিকে প্রথমেই ইউনিকোডে কম্পোজ় করেই পাঠাতে হবে।